KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৩ নং হেস্টিংস স্ট্রিট, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রমথ চৌধুরী
Title : সবুজ পত্র (Sabuj Patra)	Size : 7.5"x6"
Vol. & Number : 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5	Year of Publication : বৈশাখ ১৩২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫ আষাঢ় ১৩২৫ শ্রাবণ ১৩২৫ ভাদ্র ১৩২৫ Condition : Brittle / Good
Editor : প্রমথ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

বই পড়া। *

—:*:—

প্রবন্ধ আমি লিখি এবং সম্ভবত যত লেখা উচিত তার চাইতে বেশিই লিখি, কিন্তু সে প্রবন্ধ সর্ব্বজনসমক্ষে পাঠ করতে আমি স্বভাবতই সঙ্কুচিত হই। লোকে বলে আমার প্রবন্ধ কেউ পড়ে না। যে প্রবন্ধ লোকে স্বেচ্ছায় পড়ে না, সে প্রবন্ধ অপরকে পড়ে শোনানটা অবশ্য অত্যাচার শ্রোতাদের উপর করারই সামিল।

এ সত্ত্বেও আমি আপনাদের অনুরোধে আজ যে একটি প্রবন্ধ পাঠ করতে প্রস্তুত হয়েছি তার কারণ, লাইব্রেরি সম্বন্ধে কথা কইবার আমার কিঞ্চিৎ অধিকার আছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে 'সাহিত্য' পত্রে আমার সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রকাশিত হয় যে, আমি একজন "উদাসীন গ্রন্থকীট"। এর অর্থ, কোনও কোনও লোক যেমন সংসারের প্রতি বীতরাগ হয়ে বনে গমন করেন, আমিও তেমনি সংসারের প্রতি বীতরাগ হয়ে লাইব্রেরিতে আশ্রয় নিয়েছি। পুস্তকাগারের অভ্যন্তরে আমি যে আজীবন সমাধিস্থ হয়ে রয়েছি, এ জ্ঞান আমার অবশ্য ইতিপূর্ব্বে ছিল না। সে যাই হোক্, আমার আ-কৈশোর বন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতির দত্ত এই সার্টিফিকেটের বলে এ ক্ষেত্রে, বই পড়া সম্বন্ধে দু'চার কথা বলতে

---

* কটেজ লাইব্রেরি ও ভবানীপুর ইন্‌ষ্টিটিউটের সাহিত্য-শাখার অধিবেশনে ১৯১৮ সনের ১৯শে মে তারিখে পঠিত।

সাহসী হয়েছি। লাইব্রেরিতে বইয়ের গুণগান করাটা আমার বিশ্বাস অসঙ্গত হবে না।

(২)

আজকের সভায় যে দু'চার কথা বলব, সে আলাপের ভাষায় ও আলাপের ভাবে,—অর্থাৎ তাতে কাজের কথার চাইতে বাজে কথা ঢের বেশী থাকবে। এই বিংশ শতাব্দীতে লাইব্রেরির সার্থকতা এবং উপকারিতা সম্বন্ধে বিশেষ কোনও কথা বলবার কি প্রয়োজন আছে? এ সম্বন্ধে যা বক্তব্য তা ইতিপূর্ব্বে হাজার বার কি বলা হয় নি? তবে বই পড়ার অভ্যাসটা যে বদ্-অভ্যাস নয়, এ কথাটা সমাজকে এ যুগে মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে দেওয়া আবশ্যক; কেননা মানুষে এ কালে বই পড়ে না—পড়ে সংবাদপত্র। এ যুগে সভ্য সমাজ ভোরে উঠে করে দু'টি কাজ—এক চা-পান আর সংবাদপত্র পাঠ। একটি বিলাতি কবি চায়ের সম্বন্ধে বলেছেন যে "A cup that cheers but not inebriates"—অর্থাৎ চা-পান করলে নেশা হয় না অথচ ফূর্ত্তি হয়। চা-পান করলে নেশা না হোক্, চা-পানের নেশা হয়। সংবাদপত্র সম্বন্ধেও ঐ একই কথা খাটে। তারপর অতিরিক্ত চা পানের ফলে মানুষের যেমন আহারে অরুচি হয়—অতিরিক্ত সংবাদপত্র পাঠের ফলেও মানুষের তেমনি সাহিত্যে অরুচি হয়। আমরা দেশসুদ্ধ লোক আজকের দিনে এই মানসিক মন্দাগ্নিগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। সুতরাং সাহিত্যচর্চ্চা করবার প্রথাটা যে সভ্যতার একটা প্রধান অঙ্গ, এই সত্যটার চারদিকে আজ প্রদক্ষিণ করবার সংকল্প করেছি।

(৩)

কাব্যচর্চ্চা না করলে মানুষে জীবনের একটা বড় আনন্দ থেকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হয়। এ আনন্দের ভাণ্ডার সর্ব্বসাধারণের ভোগের জন্য সঞ্চিত রয়েছে। সুতরাং কোনও সভ্যজাতি কস্মিন্‌কালে তার দিকে পিঠ ফেরায় নি—এদেশেও নয়, বিদেশেও নয়। বরং যে জাতির যত বেশী লোক যত বেশী বই পড়ে, সে জাতি যে তত সভ্য,—এমন কথা বললে বোধহয় অন্যায় কথা বলা হয় না। নিদ্রা কলহে দিন-যাপন করার চাইতে কাব্যচর্চ্চায় কালাতিপাত করা যে প্রশংসনীয়, এমন কথা সংস্কৃতেই আছে। সংস্কৃত কবিরা সকলকেই সংসার-বিষ-বৃক্ষের অমৃতোপম ফল কাব্যামৃতের রসাস্বাদ করবার উপদেশ দিলেও সেকালে সে উপদেশ কেউ গ্রাহ্য করতেন কিনা, সে বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ আছে,—কিছুদিন পূর্ব্বে আমারও ছিল। কেননা নিজের কলমের কালি, লেখকেরা যে অমৃত বলে চালিয়ে দিতে সদাই উৎসুক, তার পরিচয় একালেও পাওয়া যায়। কিন্তু একালেও আমরা যখন ও-সব কথায় ভুলিনে, তখন সেকালেও সম্ভবত কেউ ভুলতেন না, কেননা সেকালে সমজদারের সংখ্যা একালের চাইতে ঢের বেশী ছিল। কিন্তু আমি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি যে, হিন্দুযুগে বই পড়াটা নাগরিক-দের মধ্যে একটা মস্ত বড় ফ্যাসান ছিল। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, "নাগরিক" বলতে সেকালে সেই শ্রেণীর জীব বোঝাত—একালে ইংরাজিতে যাকে man-about-town বলে। বাংলাভাষায় ওর কোনও নাম নেই, কেননা বাংলাদেশে ও জাত নেই। ও বালাই যে নেই, সেটা অবশ্য সুখের বিষয়।

(৪)

যদি অনুমতি করেন ত এই সুযোগে প্রাচীন ভারতবর্ষের নাগরিক সভ্যতার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিই। সেকালে এদেশে যেমন একদল ত্যাগী-পুরুষ ছিলেন, তেমনি আর একদল ভোগী-পুরুষও ছিলেন। ভারতবর্ষের আরণ্যক-ধর্ম্মের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় আমাদের সকলেরই আছে, কিন্তু তার নাগরিক ধর্ম্মের ক্রিয়াকলাপ আমাদের অনেকের কাছেই অবিদিত। এর ফলে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার ধারণাটা আমাদের মনে নিতান্ত একপেশো হয়ে উঠেছে। সে সভ্যতার শুধু আত্মার নয় দেহের সন্ধানটাও আমাদের নেওয়া কর্ত্তব্য, নচেৎ তার স্বরূপের সাক্ষাৎ আমরা পাব না। সেকালের নাগরিকদের মতিগতি রীতি-নীতির আদ্যোপান্ত বিবরণ পাওয়া যায়—কামসূত্রে। এ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল অন্ততঃ দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে, এবং এ গ্রন্থের রচয়িতা হচ্ছেন ন্যায়দর্শনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার স্বয়ং বাৎস্যায়ন, অতএব কামসূত্রের বর্ণনা আমরা সত্য বলেই গ্রাহ্য করতে বাধ্য; বিশেষতঃ ও সূত্র যখন সংস্কৃত সাহিত্যে শাস্ত্র হিসেবেই চিরকাল গণ্য ও মান্য হয়ে এসেছে। আমি উক্ত গ্রন্থ থেকে নাগরিকদের গৃহসজ্জার আংশিক বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

"বাহিরের বাসগৃহেও অতি শুভ্র চাদরপাতা একটি শয্যা থাকিবে, এবং তাহার উপর দুইটি অতি সুন্দর বালিশ রাখিতে হইবে। তাহার পার্শ্বে থাকিবে প্রতিশয্যিকা। এবং তাহার শিরোভাগে কুর্চ্চস্থান ও বেদিকা স্থাপিত করিবে। সেই বেদিকার উপর, রাত্রিশেষ অনুলেপন, মাল্য, সিক্থকরণ্ডক, সৌগন্ধিকপূটিকা, মাতুলুঙ্গস্রক্, তাম্বুল প্রভৃতি রক্ষিত হইবে। ভূমিতে থাকিবে পতদ্গ্রহ। ভিত্তিগাত্রে নাগ-

দন্তাবসক্তা বীণা। চিত্রফলক। বর্ত্তিকা-সমুদ্গকঃ। এবং যে কোনও পুস্তক।"

উপরোক্ত বর্ণনা একটু ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে—কেননা এর অনেক শব্দই বাংলাভাষায় প্রচলিত নেই। আমি কতকটা টীকা ও কতকটা অভিধানের সাহায্যে ঐ সকল অপরিচিত শব্দের বাচ্য পদার্থের যে পরিচয় লাভ করেছি, তা আপনাদের জানাচ্ছি। প্রতিশয্যিকার অর্থ ক্ষুদ্র পর্য্যঙ্ক, ভাষায় যাকে বলে খাটিয়া। এ খাটিয়া অবশ্য নাগরিকরা নিজেদের গঙ্গাযাত্রার জন্য প্রস্তুত রাখতেন না। তার মাথার গোড়ায় থাকত কুর্চ্চস্থান। কুর্চ্চ শব্দের সাক্ষাৎ আমি কোনও অভিধানে পাই নি। তবে টীকাকার বলেন, শয্যার শিরোভাগে ইষ্টদেবতার আসনের নাম কুর্চ্চ। আত্মবান নাগরিকেরা ইষ্টদেবতার স্মরণ ও প্রণাম না করে শয়নগ্রহণ করতেন না। সুতরাং কুর্চ্চ হচ্ছে একপ্রকার ব্রাকেট। সেকালের এই বিলাসী সম্প্রদায়—আমরা যাকে বলি নীতি, তার ধার এক কড়াও ধারতেন না;—কিন্তু দেবতার ধার ষোল আনা ধারতেন। এ ব্যাপার অবশ্য অপূর্ব্ব নয়। একালেও দেখা যায় মানুষের প্রতি অত্যাহিত অত্যাচার করবার সময় মানুষে ইষ্টদেবতাকে ঘন ঘন স্মরণ ও প্রণাম করে। যাক্ ও সব কথা। এখন দেখা যাক্ বেদিকা বস্তুটি কি?—বেদিকাতে যত প্রকার দ্রব্য রাখবার ব্যবস্থা আছে, তাতে মনে হয় ও হচ্ছে টেবিল। এবং টীকাকারের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, এ অনুমান ভুল নয়। তিনি বলেন বেদিকা ভিত্তিসংলগ্ন, হস্তপরিমিত চতুষ্কোণ এবং কৃতকুট্টিম—অর্থাৎ inlaid। অনুলেপন দ্রব্যটি হয় চন্দন, নয় মেয়েরা যাকে বলে রূপটান, তাই। মাল্য অবশ্য ফুলের

মালা। কি ফুল তার উল্লেখ নেই, কিন্তু ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, আর যাই হোক গাঁদা নয়; কেননা তাঁরা বর্ণগন্ধের সৌকুমার্য্য বুঝতেন। সিক্থকরঞ্চক হচ্ছে—মোমের কৌটা। সেকালে নাগরিকেরা, ঠোঁট আগে মোম দিয়ে পালিস করে নিয়ে, তারপর তাতে আলতা মাখতেন। সৌগন্ধিকপুটিকা হচ্ছে—ইংরাজিতে যাকে বলে powder-box। বোতল না হয়ে বাক্স হবার কারণ, সেকালে অধিকাংশ গন্ধদ্রব্য চূর্ণ আকারেই ব্যবহৃত হত। দেয়াল ছেড়ে ঘরের মেজের দিকে দৃষ্টিপাত করলে—প্রথমেই চোখে পড়ে পতৎগ্রহ, অর্থাৎ পিকদানী। তারপর চোখ তুললে নজরে পড়ে, ভিত্তি-সংলগ্ন হস্তিদন্তে বিলম্বিত বীণা। টীকাকার বলেন সে বীণা আবার "নিচোল-অবগুণ্ঠিতা"। বাংলার অনেক পদ্যলেখকদের ধারণা নিচোল অর্থে শাড়ী। "শাড়ীপরা বীণা"র অবশ্য কোনও মানে নেই। নিচোল অর্থে গেলাপ। জয়দেব যে শ্রীরাধিকাকে বলেছিলেন "শীলয় নীল নিচোলং" তার অর্থ "নীলরঙের একটি ঘেরাটোপ পর"। ইংরাজি ভাষায় ওর তর্জ্জমা হচ্ছে—put on a dark blue cloak। এখন আবার প্রকৃত প্রস্তাবে ফিরে আসা যাক্। তারপর পাই চিত্র-ফলক। সংস্কৃত কাব্যের বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায়, পুরাকালে ছবি কাঠের উপরে আঁকা হত, কাপড়ের উপরে নয়। বর্ত্তিকা সমুগকের অর্থ তুলি ও রঙ রাখবার বাক্স। তারপর বই।

নাগরিকদের গৃহের এবং দেহের এই সাজসজ্জার বর্ণনা থেকেই বুঝতে পারবেন তাঁরা কি চরিত্রের লোক ছিলেন। তারপর প্রশ্ন ওঠে, বই নিয়ে এ প্রকৃতির লোকেরা কি করতেন? কেননা নাগরিকেরা আর যাই হ'ন, তাঁরা যে সব উদাসীন গ্রন্থকীট ছিলেন না, সে বিষয়ে

আর কোনও সন্দেহ নেই। পুস্তক কি তবে এঁদের গৃহসজ্জার জন্য রক্ষিত হত, যেমন আজকাল কোন কোন ধনীলোকের গৃহে হয়? এ সন্দেহ দৃঢ় হয়ে আসে, যখন টীকাকারের মুখে শুনতে পাই যে—

"এই সকল বীণাদিদ্রব্য সর্ব্বদা উপঘাতের অর্থাৎ ব্যবহার করিয়া নষ্ট করিবার জন্য নহে। কেবল বাসগৃহের শোভা সম্পাদনার্থ ভিত্তি নিহিত হস্তিদন্তে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে। কালে ভদ্রে কখনো প্রয়োজন হইলে তাহা সেখান হইতে নামাইতে হবে।"

পূর্ব্বোক্ত সন্দেহের আরও কারণ আছে। সূত্রকার যখন বলেছেন—যঃ কশ্চিৎ পুস্তকং, অর্থাৎ "যা হোক একটা বই",—তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে যে সে বই, আর যে কারণেই হো'ক, পড়বার জন্য রাখা হত না। কিন্তু টীকাকার আমাদের এ সন্দেহ ভঞ্জন করেছেন। তাঁর কথা এই :—'যঃ কশ্চিৎ' এটি সামান্য নির্দ্দেশ হইলেও, তখনকার যে-কোনও কাব্য তাহাই পড়িবার জন্য রাখিবে, ইহাই যে সূত্রকারের উপদেশ, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।"

টীকাকারের এ সিদ্ধান্ত আমি গ্রাহ্য করি। বীণা ও পুস্তক দুই সরস্বতীর দান হলেও,—ও দুই গ্রহণ করবার সমান শক্তি এক দেহে প্রায় থাকে না। বীণাবাদন বিশেষ সাধনাসাধ্য, পুস্তকপঠন অপেক্ষাকৃত ঢের সহজ। সুতরাং বই পড়ার অধিকার যত লোকের আছে, বীণা বাজাবার অধিকার তার সিকির সিকি লোকেরও নেই। এই কারণে সকলকে জোর করে বিদ্যাশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা এ যুগের সকল সভ্য দেশেই আছে—কিন্তু কাউকে জোর করে সঙ্গীতশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা কোনও অসভ্য দেশেও নেই। অতএব নাগরিকেরা বীণা দেয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখ্‌তেন বলে যে পুঁথির ডুরি খুলতেন না, এরূপ

অনুমান করা অসঙ্গত হবে। সে যাই হো'ক, টীকাকার বলেছেন "যে-সে বই নয়, তখনকার বই"; এই উক্তিই প্রমাণ যে, সে বই পড়া হত। যে বই এখনকার নয় কিন্তু সেকালের, যাকে ইংরাজিতে বলে classics, তা ভদ্রসমাজে অনেক লোক ঘরে রাখে পড়বার জন্য নয়, দেখবার জন্য। কিন্তু হালের বই লোকে পড়বার জন্যই সংগ্রহ করে, কেননা অপর কোনও উদ্দেশ্যে তা গৃহজাত করবার কোনরূপ সামাজিক দায় নেই। আর এক কথা। আমরা বর্ত্তমান ইউরোপের সভ্য সমাজেও দেখ্‌তে পাই যে, "এখনকার" বই পড়া সে সমাজের সভ্যদের ফ্যাসানের একটি প্রধান অঙ্গ। Anatole France-এর টাট্‌কা বই পড়ি নি, এ কথা বল্‌তে প্যারিসের নাগরিকেরা যাদৃশ লজ্জিত হবেন, সম্ভবত Kipling-এর কোনও সদ্যপ্রসূত বই পড়ি নি বল্‌তে লণ্ডনের নাগরিকেরাও তাদৃশ লজ্জিত হবেন; যদিচ Anatole France-এর লেখা যেমন সুপাঠ্য, Kipling-এর লেখা তেমনি অপাঠ্য। এ কথা আমি আন্দাজে বল্‌ছিনে। বিলেতে একটি ব্যারিস্টারের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। জনরব তিনি মাসে দশ বিশ হাজার টাকা রোজগার করতেন। অত না হো'ক্, যা রটে তা কিছু বটেই ত। এই থেকেই আপনারা অনুমান করতে পারেন তিনি ছিলেন কত বড় লোক। এত বড় লোক হয়েও তিনি একদিন আমার কাছে, Oscar Wilde-এর বই পড়েন নি, এই কথাটা স্বীকার করতে এতটা মুখ কাঁচুমাচু করতে লাগলেন, যতটা চোরডাকাতরাও কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে guilty plead করতে সচরাচর করে না। অথচ তাঁর অপরাধটা কি?—Oscar Wilde-এর বই পড়েন নি, এই ত! ও সব বই পড়েছি স্বীকার করতে আমরা লজ্জিত হই। শেষটা তিনি

এর জন্য আমার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে সুরু করলেন। তিনি বল্‌লেন যে, আইনের অশেষ নজির উদরস্থ করতেই তাঁর দিন কেটে গিয়েছে, সাহিত্য পড়্‌বার তিনি অবসর পান নি। বলা বাহুল্য এ রকম ব্যক্তিকে এদেশে আমরা একসঙ্গে রাজনীতির নেতা এবং সাহিত্যের শাসক করে তুলতুম। কিন্তু সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই, এ কথা কবুল করতে তিনি যে এতটা লজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন তার কারণ, তাঁর এ জ্ঞান ছিল যে তিনি যত বড় আইনজ্ঞই হোন, আর যত টাকাই করুন, তাঁর দেশে ভদ্রসমাজে কেউ তাঁকে বিদগ্ধজন বলে মান্য করবে না।

সংস্কৃত বিদগ্ধ শব্দের প্রতিশব্দ cultured। বাৎস্যায়ন যাকে নাগরিক বলেন, টীকাকার তাঁকে বিদগ্ধ নামে অভিহিত করেন। এর থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে, এদেশে পুরাকালে culture জিনিসটা ছিল নাগরিকতার একটা প্রধান গুণ। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, একালে আমরা যাকে সভ্য বলি, সেকালে তাকে নাগরিক বল্‌ত। অপরপক্ষে সংস্কৃত ভাষায় গ্রাম্যতা এবং অসভ্যতা পর্য্যায়-শব্দ—ইংরাজিতে যাকে বলে synonyms.

(৫)

এর উত্তরে হয়ত অনেকে এই কথা বলবেন যে, সেকালে বই পড়াটা ছিল বিলাসের একটা অঙ্গ। বাৎস্যায়নই যখন আমার প্রধান সাক্ষী, তখন এ অভিযোগের প্রতিবাদ করা আমার পক্ষে কঠিন। এ যুগে অবশ্য আমরা সাহিত্যচর্চ্চাটা বিলাসের অঙ্গ বলে মনে করিনে, ও

চর্চ্চা থেকে আমরা ঐহিক এবং পারত্রিক নানারূপ সুফললাভের প্রত্যাশা রাখি। আপনারা সকলেই জানেন যে, সংস্কৃত সাহিত্যে "মাল্য চন্দন বনিতা" এ তিন একসঙ্গেই যায়, এবং ও তিনই ছিল এক পর্য্যায়ভুক্ত। কিন্তু আমাদের কাছে মাল্যচন্দনের সামিল, বনিতাও নয়, কবিতাও নয়। কাজেই আমাদের চোখে সেকালের নাগরিক সমাজের রীতিনীতি অবশ্য দৃষ্টিকটু ঠেকে। কেননা আমাদের চোখের পিছনে আছে আমাদের মন, এবং আমাদের মনের পিছনে আছে আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক বুদ্ধি। এই কারণেই প্রাচীন সমাজের প্রতি সুবিচার করতে হ'লে, সে সমাজকে ঐতিহাসিকের চোখ দিয়ে দেখা কর্ত্তব্য। তাই আমি উদাসীন গ্রন্থকীট হিসেবে নাগরিকদের উক্তরূপ সাহিত্যচর্চ্চার ফলাফল একটুখানি আলোচনা করে দেখ্‌তে চাই। বলা বাহুল্য ঐতিহাসিক হতে হলে প্রথমত বর্ত্তমানের প্রতি উদাসীন হওয়া চাই, দ্বিতীয়ত প্রাচীন গ্রন্থের কীট হওয়া চাই। আরও অনেক হওয়া চাই,—কিন্তু ও দুটি না হলে নয়।

যে সমাজে কাব্যচর্চ্চা হচ্ছে বিলাসের একটি অঙ্গ, সে সমাজ যে সভ্য—এই হচ্ছে আমার প্রথম বক্তব্য। যা মনের বস্তু তা উপভোগ করবার ক্ষমতা বর্ব্বর জাতির মধ্যে নেই, ভোগ অর্থে তারা বোঝে কেবলমাত্র দৈহিক প্রবৃত্তির চরিতার্থতা। ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি পশুরাও করে, এবং তা ছাড়া আর কিছু করে না। অপরপক্ষে যে সমাজের আয়েসীর দলও কাব্যকলার আদর করে, সে সমাজ সভ্যতার অনেক সিঁড়ি ভেঙ্গেছে। সভ্যতা জিনিসটে কি, এ প্রশ্ন কেউ জিজ্ঞাসা করলে দু' কথায় তার উত্তর দেওয়া শক্ত। কেননা যুগভেদে ও দেশ ভেদে পৃথিবীতে সভ্যতা নানা-মূর্ত্তি ধারণ করে দেখা দিয়েছে, এবং

কোন সভ্যতাই একেবারে নিরাবিল নয়; সকল সভ্যতার ভিতরই যথেষ্ট পাপ ও যথেষ্ট পাঁক আছে। নীতির দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে সভ্যতা ও অসভ্যতার প্রভেদ যে আকাশপাতাল, এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় না। তবে মানুষের কৃতীত্বের মাপে যাচাই করতে গেলে, দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে জ্ঞানে বিজ্ঞানে কাব্যকলায় শিল্পে বাণিজ্যে সভ্যজাতি ও অসভ্যজাতির মধ্যে সাত সমুদ্র তের নদীর ব্যবধান। জনৈক ফরাসী লেখক বলেছেন যে, যিনিই মানবের ইতিহাস চর্চ্চা করেছেন, তিনিই জানেন যে মানুষকে ভাল করবার চেষ্টা বৃথা। এ হচ্ছে অবশ্য ক্ষুব্ধ মনের ক্রুদ্ধ কথা, অতএব বেদবাক্য হিসেবে গ্রাহ্য নয়। সে যাই হো'ক, এ কথার উত্তরে আমি বলি যে মানুষকে ভাল না করা যাক্, ভদ্র করা যায়। পৃথিবীতে সুনীতির চাইতে সুরুচি কিছু কম দুর্লভ পদার্থ নয়। পুরাকালে সাহিত্যের চর্চ্চা মানুষকে নীতিবান না করলেও রুচিবান করত। সমাজের পক্ষে এও একটা কম লাভ নয়।

ধরে নেওয়া যাক সেকালের নাগরিক সমাজ কাব্যকে মনের বেশভূষার উপকরণ হিসেবে দেখ্‌ত। তাঁরা যে হিসাবে ওষ্ঠে যাবক ধারণ করতেন সেই হিসাবেই কণ্ঠে শ্লোক ধারণ করতেন। এ অনুমান নিতান্ত অমূলক নয়। সংস্কৃত ভাষায় একটি নাতিহ্রস্ব শ্লোকসংগ্রহ আছে, যার নাম "বিদগ্ধ মুখমণ্ডনম্"। ওরকম নামকরণের ফলে কাব্যি অবশ্য রঙের কোঠায় পড়ে যায়। সে যাই হোক্, নাগরিকদের বই পড়া যে একেবারে ভস্মে ঘি ঢালার সামিল ছিল না, এবং তাঁদের বৈদগ্ধ্য যে তাঁদের মনুষ্যত্ব অনেকটা রক্ষা করেছিল, একটি উদাহরণের সাহায্যে তার প্রমাণ দিচ্ছি। চরিত্রহীন অথচ কলাকুশল নাগরিকদের সেকালে সাধারণ সংজ্ঞা ছিল "বিট"। এই বিটের একটি ছবি আমরা

মৃচ্ছকটিকে দেখ্‌তে পাই। ঐ নাটকের রাজশ্যালক শকারের সঙ্গে বিটের তুলনা করলেই নিরক্ষর ও বিদগ্ধ জনের প্রকৃতির তারতম্য স্পষ্ট দেখ্‌তে পাওয়া যায়। উভয়েই সমান বিলাস-ভক্ত, কিন্তু শকার পশু আর বিট সুজন। শকারের ব্যবহার দেখ্‌লেও কথা শুনলে তাকে অর্দ্ধচন্দ্র দিতে হাত নিসপিস করে, অপরপক্ষে বিটের ব্যবহারের সৌজন্য, ভাষার আভিজাত্য, মনের সরসতা এত বেশী যে, তাঁকে সাদর সম্ভাষণ করে' ঘরে এনে বসাতে ইচ্ছে যায়—দু'দণ্ড আলাপ কর্‌বার জন্য। বৈদগ্ধ্য যে একটি সামাজিক গুণ, এ কথা অস্বীকার করায় সত্যের অপলাপ করা হবে। মার্জ্জিত রুচি, পরিষ্কৃত বুদ্ধি, সংযত ভাষা ও বিনীত ব্যবহার মানুষকে চিরকাল মুগ্ধ করে এসেছে এবং সম্ভবত চিরকাল করবে। এ সকল বস্তু সমাজকে উন্নত না হোক্ অলঙ্কৃত করে। এবং এ সকল গুণ কাব্য ও কলার চর্চ্চা ব্যতীত রক্তমাংসের শরীরে আপনা হতে ফুটে ওঠে না। তবে এ কথা ঠিক যে, প্রাচীন সভ্যতা এ সকল গুণের যতটা মূল্য দিত, আমরা ততটা দিই নে। তার কারণ সে কালের সভ্যতা ছিল aristocratic, আর এ কালের সভ্যতা হতে চাচ্ছে democratic. সেকালে তাঁরা চাইতেন আকার,—আমরা চাই বস্তু। তাঁরা দেখ্‌তেন মানুষের ব্যবহার, আমরা দেখ্‌তে চাই তার ভিতরটা। তাঁরা ছিলেন রূপ ভক্ত, আমরা গুণলুব্ধ। ক্লাসিক সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের তুলনা কর্‌লে এ প্রভেদ সকলেরি চোখে ধরা পড়্‌বে। এ যুগের সাহিত্যমাত্রেই রোমাণ্টিক, অর্থাৎ তাতে আর্টের ভাগ কম এবং আত্মার ভাগ বেশী। এর কারণ, এ যুগের কবিরা কাব্যে আত্মপ্রকাশ করেন। এ যুগের কবি জনগণের প্রতিনিধিও নন মুখপাত্রও নন, সুতরাং সে কবির মন নিজের মন,—লৌকিক মনও নয়, সামাজিক

মনও নয়। আর সেকালের কবিরা সামাজিকদের মনোরঞ্জন কর্‌তে চেষ্টা কর্‌তেন। সেকালের সামাজিকেরা কলাবিৎ ছিলেন বলে, সেকালের কবিরা রচনায় বস্তুর অপেক্ষা তার আকারের দিকেই বেশী মনোযোগ দিতে বাধ্য হতেন। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে দেখ্‌তে পাই, কবি কি বল্‌লেন, তার চাইতে কি ভাবে বল্‌লেন তার মর্য্যাদা ঢের বেশী। সুতরাং নাগরিকদের কাব্যচর্চ্চার ফলে প্রাচীন সাহিত্য যে আর্টিষ্টিক হয়েছে, এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে। এই সব কারণে আমরা স্বীকার কর্‌তে বাধ্য যে নাগরিকদের কাব্যচর্চ্চা একেবারে নিষ্ফল হয় নি, কেননা তার গুণে ক্লাসিক সাহিত্য অসামান্য সুষমা ও সামঞ্জস্য লাভ করেছে।

কাব্যে আর্টের মূল্য যে কত বড়, সে আলোচনায় আজ প্রবৃত্ত হব না, কেননা সে আলোচনা দু' কথায় শেষ কর্‌বার জো নেই। বহু যুক্তি বহু তর্কের সাহায্যে ও সত্য প্রতিষ্ঠা কর্‌তে হবে। কেননা আমি পূর্ব্বেই বলেছি এ যুগের ডিমোক্রাটিক আত্মা আর্টকে উপেক্ষা করে, অবজ্ঞা করে, সম্ভবত মনে মনে হিংসাও করে,—বোধহয় এই কারণে যে, আর্টের গায়ে আভিজাত্যের ছাপ চিরস্থায়ীরূপে বিরাজ করে। অথচ ডিমোক্রাসির এ সত্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, লৌকিক মন বস্তুগত বলেই তা materialism-এর দিকে সহজেই ঝোঁকে। এ বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য আর্টের চর্চ্চা আবশ্যক।

(৬)

বই পড়ার সখটা মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সখ হলেও, আমি কাউকে সখ হিসেবে বই পড়তে পরামর্শ দিতে চাই নে। প্রথমত সে পরামর্শ

কেউ গ্রাহ্য করবেন না, কেননা আমরা জাত হিসেবে সৌখীন নই—দ্বিতীয়ত অনেকে তা কুপরামর্শ মনে করবেন, কেননা আমাদের এখন ঠিক সখ করবার সময় নয়। আমাদের এই রোগ শোক দুঃখ দারিদ্র্যের দেশে জীবন ধারণ করাই যখন হয়েছে প্রধান সমস্যা, তখন সে জীবনকে সুন্দর করা মহৎ করার প্রস্তাব, অনেকের কাছেই নিরর্থক এবং সম্ভবত নির্ম্মমও ঠেকবে। আমরা সাহিত্যের রস উপভোগ করতে আজ প্রস্তুত নই, কিন্তু শিক্ষার ফললাভের জন্য আমরা সকলেই উদ্বাহু। আমাদের বিশ্বাস, শিক্ষা আমাদের গায়ের জ্বালা ও চোখের জল দুই দূর করবে। এ আশা সম্ভবত দুরাশা—কিন্তু তাহলেও আমরা তা ত্যাগ করতে পারিনে, কেননা আমাদের উদ্ধারের অন্য কোনও সদুপায় আমরা চোখের সুমুখে দেখতে পাই নে। শিক্ষার মাহাত্ম্যে আমিও বিশ্বাস করি, এবং যিনিই যা বলুন সাহিত্যচর্চ্চা যে শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। লোকে যে তা সন্দেহ করে, তার কারণ এ শিক্ষার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ তার কোনও নগদ বাজারদর নেই। এই কারণেই ডিমোক্রাসি সাহিত্যের সার্থকতা বোঝে না, বোঝে শুধু অর্থের সার্থকতা। ডিমোক্রাসির গুরুরা চেয়েছিলেন সকলকে সমান করতে, কিন্তু তাঁদের শিষ্যেরা তাঁদের কথা উল্টো বুঝে প্রতিজনেই হতে চায় বড়মানুষ। একটি বিশিষ্ট অভিজাত সভ্যতার উত্তরাধিকারী হয়েও, ইংরাজি সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমরা ডিমোক্রাসীর গুণগুলি আয়ত্ত করতে না পারি, তার দোষগুলি আত্মসাৎ করছি। এর কারণও স্পষ্ট। ব্যাধিই সংক্রামক,—স্বাস্থ্য নয়। আমাদের শিক্ষিত সমাজের লোলুপ দৃষ্টি আজ অর্থের উপরেই পড়ে রয়েছে, সুতরাং সাহিত্যচর্চ্চার সুফল

সম্বন্ধে আমরা অনেকেই সন্দিহান। যাঁরা হাজারখানা Law-report কেননা, তাঁরা একখানা কাব্যগ্রন্থও কিনতে প্রস্তুত নন, কেননা তাতে ব্যবসার কোনও সুসার নেই। নজির বা আউড়ে কবিতা আবৃত্তি করলে মামলা যে দাঁড়িয়ে হারতে হবে—সেত জানা কথা। কিন্তু যে কথা জজে শোনে না—তার যে কোনও মূল্য নেই, এইটেই হচ্ছে পেশাদারদের মহাভ্রান্তি। জ্ঞানের ভাণ্ডার যে ধনের ভাণ্ডার নয়, এ সত্য ত প্রত্যক্ষ কিন্তু সমান প্রত্যক্ষ না হলেও এও সমান সত্য নয় যে, এ যুগে যে জাতির জ্ঞানের শূন্য, সে জাতির ভাণ্ডার ধনের ভাঁড়েও ভবানী। তারপর যে জাতি মনে বড় নয়, সে জাতি জ্ঞানেও বড় নয়—কেননা ধনের সৃষ্টি যেমন জ্ঞানসাপেক্ষ, তেমনি জ্ঞানের সৃষ্টিও মনসাপেক্ষ। এবং মানুষের মনকে সবল সচল সরাগ ও সমৃদ্ধ করবার ভার আজকের দিনে সাহিত্যের উপর ন্যস্ত হয়েছে। কেননা মানুষের দর্শন বিজ্ঞান ধর্ম্ম নীতি অনুরাগ বিরাগ আশা নৈরাশ্য, তার অন্তরের স্বপ্ন ও সত্য—এই সকলের সমবায়ে সাহিত্যের জন্ম। অপরাপর শাস্ত্রের ভিতর যা আছে, সে সব হচ্ছে মানুষের মনের ভগ্নাংশ; তার পুরো মনটার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় শুধু সাহিত্যে। দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদি সব হচ্ছে মন-গঙ্গার তোলা জল—তার পূর্ণ স্রোত আবহমান কাল সাহিত্যের ভিতরই সোল্লাসে সবেগে বয়ে চলেছে; এবং সেই গঙ্গাতে অবগাহন করেই আমরা আমাদের সকল পাপ হতে মুক্ত হব।

অতএব দাঁড়াল এই যে, আমাদের বই পড়তেই হবে—কেনন বইপড়া ছাড়া সাহিত্যচর্চ্চার উপায়ান্তর নেই। ধর্ম্মের চর্চ্চা চাই কি মন্দিরে করা চলে, দর্শনের চর্চ্চা গুহায়, নীতির চর্চ্চা ঘরে, এবং

বিজ্ঞানের চর্চ্চা যাদুঘরে;—কিন্তু সাহিত্যের চর্চ্চার জন্য চাই লাইব্রেরি। ও চর্চ্চা মানুষে কারখানাতেও করতে পারে না—চিড়িয়াখানাতেও নয়।

এ সব কথা যদি সত্য হয়—তাহলে আমাদের মানতেই হবে যে, লাইব্রেরির মধ্যেই আমাদের জাত মানুষ হবে। সেইজন্য আমরা যত বেশি লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা করব, দেশের তত বেশি উপকার হবে।

আমার মনে হয় এদেশে লাইব্রেরির সার্থকতা হাঁসপাতালের চাইতে কিছু কম নয়, এবং স্কুলকলেজের চাইতে কিছু বেশি। এ কথা শুনে অনেকে চম্‌কে উঠবেন, কেউ কেউ আবার হেসেও উঠবেন। কিন্তু আমি জানি আমি রসিকতাও করছি নে, অদ্ভুত কথাও বল্‌ছি নে; যদিচ এ বিষয়ে লোকমত যে আমার মতের সমরেখায় চলে না, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। অতএব আমার কথার আমি কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য। আমার বক্তব্য আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করছি, তার সত্যমিথ্যার বিচার আপনারা কর্‌বেন। সে বিচারে আমার কথা যদি না টেঁকে, তাহলে তা রসিকতা হিসেবেই গ্রাহ্য কর্‌বেন।

আমার বিশ্বাস শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। সুশিক্ষিত লোকমাত্রেই স্ব-শিক্ষিত। আজকের বাজারে বিদ্যার দাতার অভাব নেই, এমন কি এক্ষেত্রে দাতাকর্ণেরও অভাব নেই; এবং আমরা আমাদের ছেলেদের তাঁদের দ্বারস্থ করেই নিশ্চিন্ত থাকি—এই বিশ্বাসে যে, সেখান থেকে তারা এতটা বিদ্যার ধন লাভ করে ফিরে আসবে, যার সুদে তারা বাকী জীবন আরামে কাটিয়ে দিতে পারবে।

কিন্তু এ বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক। মনোরাজ্যেও দান গ্রহণসাপেক্ষ, অথচ আমরা দাতার মুখ চেয়ে গ্রহিতার কথাটা একেবারেই ভুলে যাই। এ সত্য ভুলে না গেলে আমরা বুঝতুম যে, শিক্ষকের সার্থকতা শিক্ষা দান করায় নয়, কিন্তু ছাত্রকে তা অর্জ্জন করতে সক্ষম করায়। শিক্ষক ছাত্রকে শিক্ষার পথ দেখিয়ে দিতে পারেন—মনোরাজ্যের ঐশ্বর্য্যের সন্ধান দিতে পারেন, তার কৌতূহল উদ্রেক করতে পারেন, তার বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত কর্‌তে পারেন, তার জ্ঞান-পিপাসাকে জ্বলন্ত করতে পারেন—এর বেশি আর কিছু পারেন না। যিনি যথার্থ গুরু, তিনি শিষ্যের আত্মাকে উদ্বোধিত করেন এবং তার অন্তর্নিহিত সকল প্রচ্ছন্ন শক্তিকে মুক্ত এবং ব্যক্ত করে তোলেন। সেই শক্তির বলে, সে নিজের মন নিজে গড়ে তোলে, নিজের অভিমত বিদ্যা নিজে অর্জ্জন করে। বিদ্যার সাধনা শিষ্যকে নিজে কর্‌তে হয়। গুরু উত্তরসাধক মাত্র।

আমাদের স্কুল কলেজের শিক্ষার পদ্ধতি ঠিক উল্টো। সেখানে ছেলেদের বিদ্যে গেলানো হয়, তারা তা জীর্ণ করতে পারুক আর না পারুক। এর ফলে ছেলেরা শারীরিক ও মানসিক মন্দাগ্নিতে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে আসে। একটা জানাশোনা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটা পরিষ্কার করা যাক্‌। আমাদের সমাজে এমন অনেক মা আছেন—যাঁরা শিশুসন্তানকে ক্রমান্বয়ে গরুর দুধ গেলানোটাই শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার ও বলবৃদ্ধির সর্ব্বপ্রধান উপায় মনে করেন। গোদুগ্ধ অবশ্য অতিশয় উপাদেয় পদার্থ, কিন্তু তার উপকারিতা যে ভোক্তার জীর্ণ করবার শক্তির উপর নির্ভর করে, এ জ্ঞান ও শ্রেণীর মাতৃকুলের নেই। তাঁদের বিশ্বাস ও বস্তু পেটে

গেলেই উপকার হবে। কাজেই শিশু যদি তা গিল্‌তে আপত্তি করে, তাহলে সে যে ব্যাদড়া ছেলে, সে বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। অতএব তখন তাকে ধরে বেঁধে জোর জবরদস্তি দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। শেষটা সে যখন এই দুগ্ধপান ক্রিয়া হতে অব্যাহতি লাভ করবার জন্য মাথা নাড়তে, হাত-পা ছুঁড়তে সুরু করে—তখন স্নেহময়ী মাতা বলেন—"আমার মাথা খাও, মরামুখ দেখো, এই ঢোক, আর এক ঢোক, আর এক ঢোক" ইত্যাদি। মাতার উদ্দেশ্য যে খুব সাধু সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই—কিন্তু এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই যে, উক্ত বলাকওয়ার ফলে মা শুধু ছেলের যকৃতের মাথা খান, এবং ঢোকের পর ঢোকে তার মরামুখ দেখবার সম্ভাবনা বাড়িয়ে চলেন। আমাদের স্কুলকলেজের শিক্ষাপদ্ধতিটাও ঐ একই ধরণের। এর ফলে কত ছেলের সুস্থ সবল মন যে infantile liver-য়ে গতাসু হচ্ছে—তা বলা কঠিন। কেননা দেহের মৃত্যুর রেজিষ্টারি রাখা হয়, আত্মার মৃত্যুর হয় না।

(৭)

আমরা কিন্তু এই আত্মার অপমৃত্যুতে ভীত হওয়া দূরে থাক্, উৎফুল্ল হয়ে উঠি। আমরা ভাবি দেশে যত ছেলে পাস হচ্ছে তত শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে; পাস করা ও শিক্ষিত হওয়া যে একবস্তু নয়, এ সত্য স্বীকার কর্‌তে আমরা কুণ্ঠিত হই। শিক্ষাশাস্ত্রের একজন জগদ্বিখ্যাত ফরাসী শাস্ত্রী বলেছেন যে, এক সময়ে ফরাসীদেশে শিক্ষা-পদ্ধতি এতই বেয়াড়া ছিল যে, সে যুগে France was saved by her idlers;

অর্থাৎ যারা পাস কর্‌তে পারে নি, কিম্বা চায় নি, তারাই ফ্রান্সকে রক্ষা করেছে। এর কারণ, হয় তাদের মনের বল ছিল বলে কলেজের শিক্ষা তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল; নয় সে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করেছিল বলেই তাদের মনের বল বজায় ছিল। তাই এই স্কুল-পালানো ছেলেদের দল থেকে, সে যুগের ফ্রান্সের যত কৃতকর্ম্মা লোকের আবির্ভাব হয়েছিল।

সে যুগে ফ্রান্সে কিরকম শিক্ষা দেওয়া হত তা আমার জানা নেই, তবুও আমি জোর করে বল্‌তে পারি যে, এ যুগে আমাদের স্কুলকলেজে শিক্ষার যে রীতি চল্‌ছে, তার চাইতে সে শিক্ষাপদ্ধতি কখনই নিকৃষ্ট ছিল না। সকলেই জানেন যে, বিদ্যালয়ে মাষ্টার মহাশয়েরা নোট দেন, এবং সেই নোট মুখস্থ করে ছেলেরা হয় পাস। এর জুড়ি আর একটি ব্যাপারও আমাদের দেশে দেখা যায়। এদেশে একদল বাজিকর আছে, যারা বন্দুকের গুলি থেকে আরম্ভ করে উত্তরোত্তর কামানের গোলা পর্য্যন্ত গলাধঃকরণ করে। তারপর একে একে সবগুলি উগ্‌লে দেয়। এর ভিতর যে অসাধারণ কৌশল আছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এই গেলা আর ওগ্‌লানো দর্শকের কাছে তামাসা হলেও—বাজিকরের কাছে তা প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ ব্যাপার। ও কারদানি করা তার পক্ষে যেমন কষ্টসাধ্য, তেমনি অপকারী। বলা বাহুল্য, সে বেচারা ঐ লোহার গোলা-গুলির এক কণাও জীর্ণ কর্‌তে পারে না। আমাদের ছেলেরাও তেমনি নোটনামক গুরুদত্ত নানা আকারের ও নানা প্রকারের গোলা-গুলি বিদ্যালয়ে গলাধঃকরণ করে পরীক্ষালয়ে তা উদ্গীরণ করে দেয়। এর জন্য সমাজ তাদের বাহবা দেয় দিক্, কিন্তু মনে যেন না ভাবে যে এতে জাতির প্রাণশক্তি

বাড়্‌ছে। স্কুলকলেজের শিক্ষা যে অনেকাংশে ব্যর্থ, সে বিষয়ে প্রায় অধিকাংশ লোকই একমত। আমি বলি শুধু ব্যর্থ নয়, অনেক স্থলে মারাত্মক; কেননা আমাদের স্কুলকলেজ ছেলেদের স্ব-শিক্ষিত হবার যে সুযোগ দেয় না, শুধু তাই নয়—স্ব-শিক্ষিত হবার শক্তি পর্য্যন্ত নষ্ট করে। আমাদের শিক্ষা-যন্ত্রের মধ্যে যে যুবক নিষ্পেষিত হয়ে বেরিয়ে আসে—তার আপনার বল্‌তে আর বেশি কিছু থাকে না, যদি না তার প্রাণ অত্যন্ত কড়া হয়। সৌভাগ্যের বিষয় এই ক্ষীণপ্রাণ জাতির মধ্যেও জনকতক এমন কঠিন প্রাণের লোক আছে, এহেন শিক্ষা পদ্ধতিও যাদের মনকে জখম কর্‌লেও একেবারে বধ কর্‌তে পারে না।

আমি লাইব্রেরিকে স্কুলকলেজের উপরে স্থান দেই এই কারণে যে, এ স্থলে লোকে স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দ-চিত্তে স্ব-শিক্ষিত হবার সুযোগ পায়; প্রতি লোক তার স্বীয়শক্তি ও রুচি অনুসারে নিজের মনকে নিজের চেষ্টায় আত্মার রাজ্যে জ্ঞানের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। স্কুলকলেজ বর্ত্তমানে আমাদের যে অপকার কর্‌ছে, সে অপকারের প্রতিকারের জন্য শুধু নগরে নগরে নয়, গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য। আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, লাইব্রেরি হাঁসপাতালের চাইতে কম উপকারী নয়; তার কারণ আমাদের শিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থায় লাইব্রেরি হচ্ছে একরকম মনের হাঁসপাতাল।

(৮)

অতঃপর আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে, "বই পড়ার পক্ষ নিয়ে এ ওকালতি করবার, বিশেষতঃ প্রাচীন নজির দেখাবার কি

প্রয়োজন ছিল? বই পড়া যে ভাল, তা কে না মানে?" আমার উত্তর—সকলে মুখে মানলেও, কাজে মানে না। মুসলমান ধর্ম্মে মানব জাতি দুই ভাগে বিভক্ত—এক যারা কেতাবি, আরেক যারা তা নয়। বাংলার শিক্ষিত সমাজ যে পূর্ব্বদলভুক্ত নয়, এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় না। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় মোটের উপর বাধ্য না হলে বই স্পর্শ করেন না। ছেলেরা যে নোট পড়ে এবং ছেলের বাপেরা যে নজির পড়েন, সে দুইই বাধ্য হয়ে—অর্থাৎ পেটের দায়ে। সেইজন্য সাহিত্যচর্চ্চা দেশে একরকম নেই বললেই হয়, কেননা সাহিত্য সাক্ষাৎভাবে উদরপূর্ত্তির কাজে লাগে না। বাধ্য হয়ে বই পড়ায় আমরা এতটা অভ্যস্ত হয়েছি যে, কেউ স্বেচ্ছায় বই পড়লে আমরা তাকে নিষ্কর্ম্মার দলেই ফেলে দিই। অথচ একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না, যে জিনিস স্বেচ্ছায় না করা যায়, তাতে মানুষের মনের সন্তোষ নেই। একমাত্র উদরপূর্ত্তিতে মানুষের সম্পূর্ণ মনস্তুষ্টি হয় না। একথা আমরা সকলেই জানি যে, উদরের দাবী রক্ষা না করলে মানুষের দেহ বাঁচে না; কিন্তু একথা আমরা সকলে মানি নে যে, মনের দাবী রক্ষা না করলে মানুষের আত্মা বাঁচে না। দেহরক্ষা অবশ্য সকলেরি কর্ত্তব্য, কিন্তু আত্মরক্ষাও অকর্ত্তব্য নয়। মানবের ইতিহাসের পাতায় পাতায় লেখা রয়েছে যে, মানুষের প্রাণ মনের সম্পর্ক যত হারায়, ততই তা দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। মনকে সজাগ ও সবল রাখতে না পারলে, জাতির প্রাণ যথার্থ স্ফূর্ত্তিলাভ করে না। তারপর যে জাতি যত নিরানন্দ, সে জাতি তত নির্জ্জীব। একমাত্র আনন্দের স্পর্শেই মানুষের মনপ্রাণ সজীব সতেজ ও সরাগ হয়ে ওঠে। সুতরাং সাহিত্যচর্চ্চার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার

অর্থ হচ্ছে জাতির জীবনীশক্তির হ্রাস করা, অতএব কোনও নীতির অনুসারেই তা কর্ত্তব্য হতে পারে না,—অর্থনীতিরও নয় ধর্ম্মনীতিরও নয়।

কাব্যামৃতে যে আমাদের অরুচি ধরেছে, সে অবশ্য আমাদের দোষ নয়,—আমাদের শিক্ষার দোষ। যার আনন্দ নেই, সে নির্জ্জীব—একথা যেমন সত্য; যে নির্জ্জীব, তারও যে আনন্দ নেই—সে কথাও তেমনি সত্য। আমাদের শিক্ষাই আমাদের নির্জ্জীব করেছে। জাতীয় আত্মরক্ষার জন্য এ শিক্ষার উল্টো টান যে আমাদের টান্‌তে হবে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এই বিশ্বাসের বলেই আমি স্বেচ্ছায় সাহিত্যচর্চ্চার স্বপক্ষে এত বাক্যব্যয় করলুম। সে বাক্যে আপনাদের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হয়েছি কিনা জানি না। সম্ভবত হই নি; কেননা আমাদের দুরবস্থার কথা যখন স্মরণ করি, তখন খালি কোমল সুরে আলাপ করা আর চলে না; মনের আক্ষেপ প্রকাশ করতে মাঝে মাঝেই কড়ি লাগাতে হয়।

আপনাদের কাছে আমার আর একটি নিবেদন আছে। এ প্রবন্ধে প্রাচীন যুগের নাগরিক সভ্যতার উল্লেখটা, কতকটা ধান ভান্‌তে শিবের গীত গাওয়া হয়েছে। এ কাজ আমি বিদ্যে দেখাবার জন্য করি নি, পুঁথি বাড়াবার জন্যও করি নি। এই ডিমোক্রাটিক যুগে aristocratic সভ্যতার স্মৃতি-রক্ষার উদ্দেশ্যেই এ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছি। আমার মতে এ যুগের বাঙ্গালীর আদর্শ হওয়া উচিত প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা, কেননা এ উচ্চ আশা অথবা দুরাশা আমি গোপনে মনে পোষণ করি যে, প্রাচীন ইউরোপে Athens যে স্থান অধিকার করেছিল, ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষে বাংলা সেই স্থান

অধিকার কর্‌বে। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার বিশেষত্ব এই যে, তা ছিল একাধারে democratic এবং aristocratic; অর্থাৎ সে সভ্যতা ছিল সামাজিক জীবনে democratic, এবং মানসিক জীবনে aristocratic,—সেই কারণেই গ্রীক সাহিত্য এত অপূর্ব্ব, এত অমূল্য। সে সাহিত্যে আত্মার সঙ্গে আর্টের কোনও বিচ্ছেদ নেই, বরং দু'য়ের মিলন এত ঘনিষ্ঠ যে, বুদ্ধিবলে তা বিশ্লিষ্ট করা কঠিন। আমাদের কর্ম্মীর দল যেমন একদিকে বাংলায় ডিমোক্রাসী গড়ে তুল্‌তে চেষ্টা করেছেন, তেমনি আর একদিকে আমাদেরও পক্ষে মনের aristocracy গড়ে তোলবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এর জন্য চাই সকলের পক্ষে কাব্য-কলার চর্চ্চা। গুণী ও গুণজ্ঞ উভয়ের মনের মিলন না হলে, কাব্য-কলার আভিজাত্য রক্ষা করা অসম্ভব। সাহিত্য-চর্চ্চা করে দেশসুদ্ধ লোক গুণজ্ঞ হয়ে উঠুক—এই হচ্ছে দেশের লোকের কাছে আমার সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

সাহিত্যের জাতরক্ষা।

—:০:—

ভৌগলিক সীমানা আর যেখানেই থাক্ না কেন, তিনটী রাজ্যে কিন্তু তার কোন অস্তিত্ব নেই, অর্থাৎ চিন্তার রাজ্যে, ভাবের রাজ্যে, ও রসের রাজ্যে। আর এই চিন্তা, ভাব ও রস—এ তিনটী হচ্ছে সাহিত্যের সম্পত্তি। সুতরাং এ কথা বল্‌লে বোধ হয় অযৌক্তিক হবে না যে, সাহিত্য-সাম্রাজ্যের এমন কোন একটা বাঁধা "ফ্রন্‌টিয়ার" নেই, যেটা কোন দিনই ভাঙা চল্‌বে না।

কিন্তু এমন অনেকে আছেন যাঁরা মনে করেন যে, ওটা একটা ডাহা বাজে কথা ও মিছে কথা। আর সেইজন্যে এই অনেকের মধ্যে কেউ কেউ বাংলা সাহিত্যের জাতরক্ষার একটা হুজুগ বর্ত্তমানে তুলেছেন। কারণ বর্ত্তমান বাংলা-সাহিত্য নাকি কালাপানিফের্ত্তা—ম্লেচ্ছভাবাপন্ন। এ সাহিত্যের কোঁচার নীচে দিয়ে নাকি প্যাণ্টালুনের পা বেরিয়ে পড়েছে দেখা যাচ্ছে—জামার ভিতর থেকে নাকি নেক্‌টাই কলার উঁচু হয়ে উঠেছে বোঝা যাচ্ছে। বাঙালী কবি নাকি এমন সব কবিতা লিখছেন, যা' বিদেশীরা কোনরকম ভাষ্যের সাহায্য না নিয়েই সোজাসুজি বিনি মেহনতে বুঝ্‌তে পারছেন। সুতরাং একথা ত মান্‌তেই হবে যে, বাঙালী কবির কাব্য বাঙালীর জাতীয় সাহিত্য নয়—সেটা হচ্ছে বিদেশী সাহিত্য। অতএব বাঙালী জাতির মঙ্গলের জন্য তার

সাহিত্যের জাতরক্ষার একটা ব্যবস্থা হওয়া নিতান্তই দরকার। ভারতবর্ষের মাটির এম্‌নি গুণ!

আমরা যে-সময়টায় বেঁচে আছি, সে সময়ের বাংলা-সাহিত্য বল্‌লে প্রথমত ও প্রধানত রবীন্দ্রনাথকেই বোঝায়—এ কথাটা বল্‌লে অনেকের আরামের ব্যাঘাত ঘট্‌বে জানি, কিন্তু আশা করি এটা মিথ্যা প্রলাপ নয়। এই রবীন্দ্রনাথের রচনা নাকি সব বিদেশী; কারণ তাঁর লেখা নাকি অতি সহজে ইংরেজিতে অনুবাদ করা যায়। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, তা ইংরাজিরই অনুবাদ। সেদিন আমার এক বাংলাভাষাভিজ্ঞ জাপানী বন্ধু বল্‌ছিলেন যে, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের লেখা অতি সহজে জাপানীতে অনুবাদ করা যায়—সুতরাং তাঁর লেখা যে জাপানী-সাহিত্যের অন্তর্গত, তার কোন ভুল নেই। কিছুদিন পূর্ব্বে আমার এক তামিল বন্ধু বল্‌ছিলেন যে, (ইনিও বেশ বাংলা জানেন) বঙ্কিমের নভেলগুলো জলের মতো তামিলে অনুবাদ করা যায়। সুতরাং বঙ্কিম প্রকৃতপক্ষে বাংলা-সাহিত্য রচনা করেন নি—তিনি সেবা করেছেন আসলে তামিল-সাহিত্যের। অতএব এটা স্পষ্ট যে, বর্ত্তমান বাংলা-সাহিত্য বলে' কোন পদার্থই নেই। তার কিছুটা ইংরেজি, কিছুটা জাপানী, কিছুটা তামিল—আর বাকীটা হিন্দি, মারাঠি, ফার্‌সী, ফরাসী, ইটালিয়ান ও রাশিয়ান মিশিয়ে। মধুসূদন যে খাঁটী জার্ম্মাণ ভাষায় মেঘনাদ-বধ রচনা করেছেন, সেটা ত আমরা সবাই জানি। আশ্চর্য্য আমাদের সাহিত্যিকদের শক্তি ও আত্ম-ত্যাগ! এতদিন ধরে' তাঁরা কায়-মন-প্রাণে পরের সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে গেলেন। আর অপূর্ব্ব আমরা 'রিপ্ ভ্যান্ উইঙ্কলে' নব সংস্করণ—জেগে থেকেও তাঁদের এ প্রতারণাটা ধর্‌তে

পারলেম না! তাঁরা সম্পদ দিয়ে গেলেন পরকে, আর শ্রদ্ধা নিয়ে গেলেন আমাদের। যাহোক্, এতদিনে সৎ-সমালোচকের দৃষ্টির গুণে তাঁদের এ প্রবঞ্চনাটা আজ ধরা পড়ে গেল—মন্দের ভাল! তাই আমরা আজ আমাদের সাহিত্যের জাতরক্ষার্থে বদ্ধপরিকর হয়েছি—ভারতবর্ষের সনাতন মাটির এমনি গুণ! এখানে কিছুই নতুন হবার জোটি নেই!

কিন্তু মুস্কিলের কথা এই যে, ভারতবর্ষের মাটী যতটা স্থিতিশীল, ভারতবাসীর মনটা ততটা নয়। আর যে জিনিসটা সাহিত্যিক গড়ে' তোলে, সেটা দেশের মাটি নয়—দশের মন। আর এই মন জিনিসটা গতিশীল। কিন্তু সে গতি নিরেট পাকা সড়কের মতো নয়—সেটা হচ্ছে তরল উজ্জ্বল স্রোতস্বিনীর মতো—কাজেই এ গতিতে ভাঙাগড়া আছে—আর যেখানে ভাঙাগড়া আছে সেখানেই পরিবর্ত্তন আছে—এক রূপ থেকে আর এক রূপে, এক ভাব থেকে আর এক ভাবে, এক সুর থেকে আর এক সুরে। আর যেহেতু সাহিত্য জিনিসটা জাতীয় মনের দর্পণস্বরূপ, সেজন্যে সেখানে যে যুগে যুগে জাতীয় মনের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিম্ব পড়বে, সেটা লজিকের পাতা না উল্‌টিয়েও বলা যায়; কেননা মনকে ফাঁকি দিয়ে আর যাই করা যাক—কাব্যও লেখা যায় না, সাহিত্যও গড়া যায় না।

সুতরাং দাঁড়াল এই যে, আমাদের সাহিত্যকে যদি একটা বিশিষ্ট ভাব বিশিষ্ট রূপ বিশিষ্ট সুরের মাঝে আবদ্ধ রাখতে চাই, তবে আমাদের জাতীয় মনটাকে আবদ্ধ করে রাখতে হবে। সে মনে যেন নব নব ভাব, নব নব সুর, নব নব চিন্তা না জাগে; নবীন প্রাণের নব অনুরাগকে আমাদের অবজ্ঞার ও অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখতে শিখতে

হবে—নইলে আমাদের প্রাণ যে আমাদের মনকে ভুলিয়ে নিয়ে কোন্ পথে ছুটবে তার বিন্দুমাত্র ঠিক নেই। আর প্রাণ ছাড়া মন নেই—যদি ও বা থাকে, সে মন জীবন্ত সাহিত্য গড়তে পারে না। কারণ সাহিত্যিকের প্রাণ দিয়েই তার সাহিত্য প্রাণবান্—মন জোগায় শুধু তার দেহ।

সুতরাং আমাদের পুরাতন সাহিত্যকে সনাতন করে' তুলতে চাইলে প্রথমত আমাদের জাতীয় প্রাণটাকে নষ্ট করে' আমাদের সাহিত্যিকদের প্রাণ-মরা হ'তে হবে। সাহিত্যিকরা প্রাণ-মরা হ'লে তাদের চারপাশে "সনাতন জড়তার" দেয়াল এক রাত্তিরে মাথা উঁচু করে' দাঁড়াবে। আর সেই "সনাতন জড়তার" দেয়ালের মধ্যে সাহিত্যই বল আর যাই বল, সব সনাতন হ'য়ে উঠ্‌বে আপনাআপনি—তার জন্যে আর কাউকেই কিছু করতে হবে না। কিন্তু যতক্ষণ মানুষের ভিতরে একটুও প্রাণ আছে, ততক্ষণ তা হবার উপায় নেই। প্রাণের একটা মহৎ দোষ এই যে, সে চল্‌তে চায়; কারণ এই চলাই তার সত্য—আর সেই জন্যে এই চলার মধ্য দিয়ে সে চারিদিকে আনন্দের বান ডাকিয়ে যায়। আর মানুষের যা কিছু সত্য সৃষ্টি—তার সাহিত্যিক জীবনেই হোক্ বা তার কর্ম্ম-জীবনেই হোক্, তার জন্ম এই আনন্দের মধ্যে। প্রাণের এম্‌নি একটা মহৎ দোষ আছে বলেই আমাদের দেশের যোগী ঋষিরা—অবশ্য "অপ্রাচীন দার্শনিক যুগের"—প্রাণের উপরে এমন খড়্গহস্ত। তাঁরা প্রাণকে কায়দা করবার কত কত উপায় বের করেছেন; কারণ প্রাণ যতদিন আছে ততদিন নির্ব্বাণ নেই। কেননা প্রাণকে না মার্‌তে পার্‌লে জগৎটা নিরানন্দ হ'য়ে ওঠে না। আর জগৎটা নিরানন্দ হ'য়ে না উঠলে নির্ব্বাণেরও কোন মূল্য থাকে না।

কিন্তু প্রাণকে কৈবল্য পাইয়ে দেবার পথে একটি মস্ত বাধা সৃষ্টি করে' রেখেছেন স্বয়ং ভগবান। সেটি হচ্ছে জীবজগতের আত্মরক্ষার দুর্বার ইচ্ছা—instinct. এখন আমরা পুরাতনকে সনাতন করে' রাখতে পারব কি না, তা নির্ভর করবে মানুষের এই আত্মরক্ষার instinct এবং সাহিত্যের জাতরক্ষা অভিলাষী সমালোচকের বুদ্ধিবিচার—এ দুয়ের মধ্যে কে জয়ী হবে, তার উপরে। এ দু'য়ের মধ্যে যে সংগ্রাম—সে সংগ্রামের ফলাফল সম্বন্ধে আমাদের কিন্তু বিন্দুমাত্র সন্দেহ বা ভয় নেই। প্রাণের জোরে বুদ্ধিকে একদিন উদার হ'য়ে উঠতেই হবে। তখন সে বুঝবে যে একটা জাতির প্রতিভা যে সাহিত্য গড়ে' তোলে, তাই তার জাতীয় সাহিত্য। নইলে শেক্সপীয়র শেলী ও 'শ' তিন জনের রচনাই ইংরেজী-সাহিত্য বলে' গ্রাহ্য হ'ত না। কারণ এঁদের তিন জনের মধ্যে যেটুকু মিল আছে সেটুকু হচ্ছে এই যে, তিন জনের রচনাই ইংরেজি ভাষায় লেখা। এ ছাড়া আর যদি কিছু মিল থাকে তবে বুদ্ধির চোখে দূরবীণ লাগিয়েও সে মিলটা ধরা যায় কি না সন্দেহ।

(২)

আসল কথা হচ্ছে এই যে, কোন জাতিরই জাতীয় সাহিত্যের জাঁত বলে' কোন বস্তু নেই, সুতরাং তা' রক্ষা করবারও কোন সমস্যা নেই। একটা জাতি যতদিন ধরে' বেঁচে থাকে, ততদিন ধরে' তার সাহিত্যই রচিত হ'তে হ'তে চলে। যুগে যুগে একটা জাতির মনের কথা প্রাণের ব্যথা হৃদয়ের সুখ দুঃখ আবেগ আকাঙ্খার পরিবর্ত্তন নানা নৈসর্গিক ও

অনৈসর্গিক কারণে হ'তে হ'তে চলেছে—আর তার সাহিত্যে তারই ছাপ পড়ছে। সুতরাং একটা জাতীর জীবনে বিশেষ কোন সন তারিখ পর্য্যন্ত দাগ দিয়ে বলা চলে না যে সেই পর্য্যন্ত তার সাহিত্য জাতীয়, তার পর যা'—তা' পরদেশী। "জাতীয় সাহিত্য" সম্বন্ধে আসল প্রশ্ন সেটা—"জাতীয় কি না?" তা নয়—কিন্তু—"সাহিত্য কি না?"—তাই। কারণ সব পদ্যই যেমন কাব্য নয়, তেমনি সব লেখাই সাহিত্য নয়। সুতরাং আজ আমাদের প্রশ্ন এ নয় যে, "আমাদের সাহিত্য জাত রক্ষা করে' চলেছে কি না?"—আমাদের প্রশ্ন এই যে "আমাদের জাতি সাহিত্য রচনা করে' চলেছে কি না?"

কিন্তু আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের সাহিত্য কোন্ সন পর্য্যন্ত জাতীয়, তার একটা হিসেব নিকেশ এর মধ্যেই করে' ফেলেছেন। তাঁরা বলতে সুরু করেছেন, যে বাংলা ভাষায় ফুল ফল আকাশ বাতাস চাঁদ চকোর দিয়ে যদি কোন কাব্য রচনা হয়, তবে সেটা হবে নিতান্ত বিদেশী; এবং বাঙ্গালী কবি যদি অনন্তের দিকে মুখ করে' বসে থাকেন, তবে তাঁর কাব্যে জাতীয়তার প্রাণান্ত হবে—কারণ অনন্তের আলো আর দিগন্তের বাতাসটা নাকি বাংলা ভাষার প্রাণে সয় না। অর্থাৎ এঁরা বলতে চান যে, মানুষের মুখের ভাষা তার প্রাণের আশার চাইতে বড়—যেমন অনেকে বলে থাকেন যে মনুসংহিতার মূল মানুষের জীবনের গতি-ভঙ্গিমার চাইতে সত্য। আসল কথা হচ্ছে এই যে, অনন্তের আলো ও দিগন্তের বাতাস বাঙ্গালী কবির অন্তরে তার মোহিনী রূপ ফেলেছে কিনা—তা যদি ফেলে থাকে তবে বাংলা ভাষায় তা মোহন হ'য়ে ফুটবেই। কারণ ভাষা মানুষের—মানুষ ভাষার নয়। মানুষই ভাষার জন্ম দিয়েছে আপনার আত্মার শক্তিতে—মানুষই শব্দে অর্থ দিয়েছে

আপনার তপঃ প্রভাবে—মানুষই অর্থকে মন্ত্রে পরিণত করেছে আপনার উগ্র তপস্যায়। ভাষা মানুষের জন্ম দেয় নি—তার প্রাণেরও না, মনেরও না, হৃদয়েরও না।

এই কথাটা আমাদের আজ ভাল করে বুঝতে হবে যে, যে-কোন যুগের চাইতে অনন্তকাল অনেক বড়—আর সে অনন্ত কালে মানুষের জীবনে কতরকম সম্ভব অসম্ভব ঘট্‌তে পারে তার পরিমাণ কেউ দিতে পারে না—তার অনুমান কেউ কর্‌তে পারে না। আমাদের বুঝতে হবে যে, যে কোন জাতি, যে-কোন সমাজ, যে-কোন নেশানের চাইতে প্রত্যেক মানুষ অনেক বড়—নইলে জার্ম্মাণীর ষ্টেট আইডিয়া হত সমাজ-সমস্যার শেষ ও শ্রেষ্ঠ মীমাংসা। আবার যে-কোন মানুষের চাইতে প্রত্যেক কবি বড়—নইলে এ পৃথিবীতে সবার চাইতে তাজ্জব ব্যাপার হত—ইংলিশ নেশানের মতো একটা নেশানের পক্ষে শেক্সপীয়রকে জন্ম দেওয়া। সুতরাং যে-কোন কবির চারপাশে তার জাতীয়তার দোহাই দিয়ে গণ্ডি টান্‌লে, সেই কবিকেই আমরা ছোট করব—তার জাতিকে বড় করতে পারব না।

কিন্তু সাহিত্যে জাত বাঁচিয়ে চলার দল আজ এই বলে' আব্দার ধরেছেন যে, আমাদের যদি কাব্য লিখতে হয়, তবে সেকাব্য লিখতে হবে বৃন্দাবনের,—তা সে জিওগ্রাফির বৃন্দাবনই হোক, বা হৃদ্‌বৃন্দাবনই হোক; আমাদের যদি গান বাঁধতে হয়, তবে সে-গান হওয়া চাই রাধাকৃষ্ণের—তা সে রাধাকৃষ্ণ পৌরাণিকই হোক্ বা আধ্যাত্মিকই হোক্; যদি নাটক লিখতে হয় ত শ্রীরাধার মানভঞ্জন—বড় জোর সুভদ্রাহরণ। কিন্তু রাধাকৃষ্ণই বাঙ্গালী কবির অন্তরে চিরটা কাল সত্য হয়ে থাক্‌বে সৃষ্টির কোন্ নিয়মানুসারে, সেটা অবশ্য আমাদের

এ পর্য্যন্ত এঁরা বাৎলিয়ে দেন নি। আর রাধাকৃষ্ণ চিরটা কাল যে কেন নায়কনায়িকার স্থান মৌরসি পাট্টা করে বসে থাকবেন, তাও বোঝা যায় না—অবশ্য একটা কারণ ছাড়া। সেটা হচ্ছে এই যে, এঁরা দু'জনেই পুরাতন। আর পুরাতনের প্রতি সনাতন মনের টান চিরকালই দেখা যায়। কিন্তু মানুষ নিজে একদিন যা' তৈরি করেছে, তা' দিয়ে আর একদিন তাকেই আবদ্ধ কর্‌তে চাওয়ার মতো মূর্খতা মানুষের জীবনে আর কিছু নেই।

যাহোক্, এঁদের এই মতের বিরুদ্ধে আমাদের কথা বল্‌তেই হবে, নইলে আমরাও হব সেই চীনেম্যানের সামিল—যে বলেছিল যে তার মাথাটা আর চীনে-মাথা নেই, সেটা হয়ে গেছে বিদেশী মাথা—কেননা সেমাথা থেকে টিকি কেটে ফেলা হয়েছে। চীনেম্যানের বুদ্ধি তাকে বোঝবার অবসর দেয় নি যে, তার মাথার ওপরেই চীনে-টিকি গজিয়েছিল—তার টিকির আগায় চীনে-মাথা গজায় নি।

(৩)

কোন মানুষ দুইমুহূর্ত্ত এক লোক নয়। দু'মুহূর্ত্ত এক হলেও দু' দিন এক নয়—দু' দিন এক হলেও দু' বছর এক নয়। তার দেহের ত কথাই নেই—সেটা আমাদের চর্ম্মচক্ষেই ধরা পড়ে—কিন্তু তার অন্তরও পলে পলে তিলে তিলে নূতন হ'য়ে উঠ্‌ছে—নব নব কল্পনা—নব নব আশা আকাঙ্খা দিয়ে—নব নব বেদনার মধ্যে দিয়ে। কেননা মানুষের জীবনের রাগ এক নয়—সহস্র। মানুষের অন্তর-দেবতার জীবন-পথে অভিযান হয় সহস্র রাগিণীতে বাঁশী বাজিয়ে—সহস্র

রঙের নিশান উড়িয়ে, এর সত্যতা প্রতিপন্ন করবার জন্য বোধহয় প্রমাণের দরকার নেই। কারণ এ সব আমাদের দেখা কথা—অর্থাৎ Facts. এ সত্ত্বেও যদি কেউ উপরের কথায় আপত্তি তোলেন, তবে এই বল্‌লেই যথেষ্ট হবে যে, তিনি নিতান্তই একজন তার্কিক—আর কিছু নন্।

মানুষের সম্বন্ধে এই কথাটা যেমন সত্য, একটা জাতি বা সমাজের পক্ষেও এটা ঠিক তেমনি সত্য। এই যে আমরা বাঙালী জাতি—আমরা আর্য্য না অনার্য্য, মঙ্গোল না দ্রাবিড়—না সবগুলো মিশিয়ে একটা কিছু—সে সম্বন্ধে কোন থিওরি খাড়া করবার অধিকার আছে মাত্র এক নৃ-তত্ত্ববিদের। কিন্তু এমন যদি ব্রাহ্মণ আজ বাংলাদেশে থাকেন, যিনি বুক ঠুকে সাহস করে' বল্‌তে পারেন যে, তাঁর ধমনীর প্রত্যেক বিন্দু শোণিত আর্য্য-শোণিত—তবে সেই বাঙালী ব্রাহ্মণের সঙ্গে সেকালের আর্য্য ব্রাহ্মণ ঋষ্যশৃঙ্গের যে মিলটা পাওয়া যাবে, সেটা হচ্ছে এই যে, তাঁরা দু'জনেই মানুষ। কিন্তু যেহেতু মানুষ গরু গাধা নয়, সেই জন্যে আজকার এই মানুষ আর সে দিনের সেই মানুষের মধ্যে ভিতরের দিকটায় একটা প্রকাণ্ড অমিল দাঁড়িয়ে গেছে—সে এম্‌নি অমিল যে এদের এক জনের কথা আর এক জনের বুঝতে হলে একছত্র কথার পঞ্চাশ পত্র টীকা না হ'লে চলে না। পাঁচ ছ' শ বছর আগেকার বাঙালী আর আজকের বাঙালী এক নয়। পাঁচ ছ' শ বছর আগের বাঙালী চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির জন্ম দিয়েছে। আর আজকের আমরা যে চণ্ডীদাস বা বিদ্যাপতি নই, তা সাময়িক পত্রিকার কোন কোন কবিতাতে স্পষ্ট করে' লেখা থাকে দেখ্‌তে পাওয়া যায়—যাঁর চোখ আছে তিনিই সেটা পড়তে পারেন। এখন

এই যে একটা মানুষের বা সমাজের বা জাতির পরিবর্ত্তন—তা কেন হয়, বা কেমন করে' হয়, এ প্রবন্ধে সেটা আলোচনা করবার দরকার নেই। এ প্রবন্ধে এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে এ-পরিবর্ত্তন ঘটে—এ সম্বন্ধে আর কোন ভুল নেই।

নদীর মুখ বন্ধ হয়ে গেলে তার স্রোতহীন জল শৈবালদলে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তখন আর সেখানে কল কল ছল ছল তান ওঠে না,—ওঠে শুধু মণ্ডূককুলের ঐক্যতান সঙ্গীত। এতো গেল নদীর কথা। তেমনি মানুষের জীবনের যে-কোন রসকে আবদ্ধ করে' রাখ্‌লে তা কিছু-দিনের মধ্যেই হয়ে ওঠে তাড়ি। আর সে তাড়ি পান করে' মানুষে যে লীলাখেলা করে, তা' আর যাই হোক্ আধ্যাত্মিক মোটেই নয়। সুতরাং কোন এক যুগের মানুষের অনুভূত কোন এক বিশেষ রসকে সনাতন করে তোলায় মানুষের বিপদ আছে। তাই এমন যে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম—সে বৈষ্ণবধর্ম্মের রসতত্ত্বও মেতে গিয়ে, হয়ে দাঁড়াল আদিরস। আর এই আদিরসের রঙে রঙীন্ হয়ে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে ছবি ফুটে উঠ্‌ল, তার রস হাস্যও নয় করুণও নয়—তার রস বীভৎস। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষের কোন বিশেষ অনুভূতিকে মানুষের পক্ষে সনাতন করে তুলতে কেউ-ই পারেন না—কারণ তা সনাতন করে তুল্‌তে পারার অর্থ ভগবানের এ সৃষ্টি-লীলার অবসান। তাই স্বয়ং বুদ্ধদেব তা পারেন নি—স্বয়ং যীশুদেবও কৃতকার্য্য হন নি। প্রমাণ—এই দুই মহা পুরুষের আজকালকার শিষ্যেরা।

সুতরাং যখন মানুষের, সমাজের, জাতির পরিবর্ত্তন হচ্ছে—মানুষের জীবন-দেবতার লীলা-বিলাসের পরিবর্ত্তন হচ্ছে—যুগে যুগে তার অন্তরে নব নব আকর্ষণ সত্য হয়ে উঠে আনন্দের ডাক তাকে

নব নব পথে আহ্বান করছে—তখন তারই রচিত সাহিত্যে একই রকমের রস, একই রকমের সুর, একই রকমের ভঙ্গী চিরন্তন করে রাখবার চেষ্টাটা যে কেবল বিজ্ঞান-সম্মতই নয় তা নয়—সেটা সহজ জ্ঞানসম্মতও নয়। বর্ত্তমানের মানুষকে অস্বীকার করে যদি আমরা তার অতীতকেই বড় করে তুলি, তবে সামাজিক জীবনে যেমন আমাদের মিলেছে ভণ্ডামি—তেমনি সাহিত্যিক বা কবির কাছ থেকে আমাদের যা' মিলবে সে হচ্ছে রসহীন ছোবড়া, আর কিছু নয়—বড় জোর শক্তিশালী যাঁরা তাঁদের হাতে গড়ে উঠবে চাকচিক্য-ময় প্রাণহীন প্রতিমা। কারণ মিথ্যা যেখানে, সেখানে মানুষ আনন্দ পেতে পারে না—আর যেখানে সে নিজে আনন্দ পায় না, সেখানে সে অপরকে আনন্দ দিতে কিছুতেই পারে না—মরে গেলেও নয়। সুতরাং আজ যাঁরা বৈষ্ণব-সাহিত্যকে আদর্শ করে তুলে, মনে করছেন যে তাঁরা বাঙালী জাতিকে একটা মহত্ত্বের পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন—তাঁরা প্রকৃতপক্ষে বাংলার সাহিত্যিকদের একটা মস্ত মিথ্যা পথই দেখিয়ে দিচ্ছেন। এঁদের একটা কথা মনে রাখা উচিত যে, যেটা চলে আসছে সেটাই যদি চিরকাল চলে আসে, তবে আজ যেটা চলে আসছে সেটাও চলে আসতে পারত না।

(৪)

এই সব কথা মনে করেই আমরা বাংলার নবীন ও তরুণ যাঁরা তাঁদের আজ এই একটা সাবধানের ইঙ্গিত করা কর্ত্তব্য বলে মনে করছি যে, তাঁদের মধ্যে যাঁরা বীণাপাণির মন্দিরে আপনার জীবনের

সত্য খুঁজে পেয়েছেন—বীণাপাণির বীণার তানে যাঁদের মন মজেছে—তাঁরা যেন সে বীণাপাণির মন্দিরে প্রবেশ করেন—আপনার জীবন-দেবতার সত্য অর্ঘ্য নিয়ে, কোন অতীতকে নিয়ে নয়—তা সে অতীত যত বড়ই হোক, যত মহানই হোক, যত লোভনীয়ই হোক। সাহি-ত্যিক জীবনে সফলতা লাভের একই পন্থা—আপনার অন্তরের সত্য। সাহিত্যিকের আপনার জীবনের সত্যের মধ্যেই সেই ফুলগুলি ফুটে ওঠে—যে ফুল দিয়ে বীণাপাণি নিভৃতে বসে তার জন্যে বিজয়মাল্য রচনা করেন। এ পথের পথিকের আর কোন পন্থা নেই। শুধু এ পথেরই বা বলি কেন—কোন পথের পথিকেরই অন্য পন্থা নেই—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

আজ বাংলার মানুষকে আহ্বান করে' আমরা বলছি যে, তাঁরা যেন বাঙালীর মিথ্যা জাতীয়তার নামে আপনার ভিতরের মানুষকে খাটো না করেন। তাঁরা যেন না ভোলেন যে, বাহিরের জগতে আমরা বাঙালী কিন্তু মনের জগতে আমরা মানুষ। সামাজিক জীবনে ত মানুষ আপনার চারদিকে গণ্ডী টানতে বাধ্য—নইলে সংসার চলে না। কিন্তু মনের জগতে তার অসীম স্বাধীনতা। মনের জগতের এই স্বাধীনতার সংকোচ যেন তাঁরা কোন দিনই না ঘটান। দেশভেদে, জাতিভেদে, আচারভেদে, বর্ণভেদে, ধর্ম্মভেদেও মানুষে মানুষে দ্বন্দ্বের অন্ত নেই—কিন্তু আমরা এই মনের জগত চিরকাল উন্মুক্ত রেখে যেন আশা করতে পারি যে বাহিরের সহস্র অমিল সত্ত্বেও বিশ্ববাসীর একদিন এখানে মিলন হবে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ছোট গল্প।

—:×:—

আমরা পাঁচজনে মিলে, এই যুদ্ধ নিয়ে বাক্-যুদ্ধ কর্‌ছিলুম। সুপ্রসন্ন হঠাৎ তর্কে ক্ষান্ত দিয়ে, একখানি বাঙলা বইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগলেন। আমরা তাঁর পড়ায় বাধা দিলুম না। আমরা জানতুম যে তাঁর সঙ্গে কারও মতের মিল হচ্ছে না বলে, তিনি বিরক্ত হয়েছেন। এ অবস্থায় তাঁকে ফের আলোচনার ভিতর টেনে আন্‌তে গেলে, তিনি মহা চটে যেতেন। আমি বরাবর লক্ষ্য করে আস্‌ছি যে, এই যুদ্ধ নিয়ে কথা কইতে গেলেই নিতান্ত নিরীহ ব্যক্তির অন্তরেও বীররসের সঞ্চার হয়, শেষটা তর্ক একটা মারামারি ব্যাপারে পরিণত হয়। সুতরাং আমি কথাটা উল্টে নেবার মনে মনে একটা সদুপায় খুঁজ্‌ছি, এমন সময় সুপ্রসন্ন হঠাৎ আবার বইখানা টেবিলের উপর সজোরে নিক্ষেপ করে, বলে উঠ্‌লেন—Nonsense.

কথাটা এত চেঁচিয়ে বল্‌লেন, যে তাতে আমরা সকলেই একটু চম্‌কে উঠ্‌লুম।

আমি বল্লুম "কি nonsense হে"? সুপ্রসন্ন বল্‌লেন—

—"তোমাদের এই বাঙলা বইয়ে যা লেখা হয় তাই। সাধে ভদ্র-লোকে বাঙলা পড়ে না। এই বইখানা খুলেই দেখি লেখক বল্‌ছেন, ছোট গল্প প্রথমত ছোট হওয়া চাই, তারপর তা গল্প হওয়া চাই। কি চমৎকার definition। এর পরেও লোকে বলে বাঙালীর শরীরে লজিক নেই!"

অনুকূল এই শুনে একটু হেসে উত্তর কর্‌লেন,—

—"ওহে অত চটো কেন? দেখ্‌ছ না লেখক নিজের নাম রেখেছেন 'বীরবল'। ঐ থেকেই তোমার বোঝা উচিত ছিল যে ও হচ্ছে রসিকতা।"

—"তোমরা যাকে বলো রসিকতা আমি তাকেই বলি nonsense. একটা জোড়া কথাকে ভেঙ্গে বলায় মানুষে যে কি বুদ্ধির পরিচয় দেয় তা আমার বুদ্ধির অগম্য।"

এ শুনে প্রশান্ত আর চুপ করে থাক্‌তে পারলেন না। তিনি ভুরু কুঁচকে বল্‌লেন,—

—"তোমার বুদ্ধির অগম্য হলেই যে তা' আর সকলের বুদ্ধির অগম্য হতে হবে এমন কোনও কথা নেই। বীরবলের ও কথা nonsenseও নয় রসিকতাও নয়—ষোল আনা সাচ্চা কথা।"

যে যা, বল্‌ত প্রশান্ত তার প্রতিবাদ কর্‌ত; এই ছিল তার চিরকেলে স্বভাব। সুতরাং সে সুপ্রসন্ন ও অনুকূল দু'জনের দ্বিমতকে এক বাণে বিদ্ধ করায়, আমরা মোটেই আশ্চর্য্য হলুম না। বরং নিজের মতকে সে কি করে' প্রতিষ্ঠা করে তাই শোনবার আগ্রহ, আমার মনে জেগে উঠ্‌ল। তর্কের মুখে প্রশান্ত অনেক নতুন কথা বল্‌ত। তাই আমি বল্লুম—

—"দেখো প্রশান্ত, রসিকতাকে যে সত্য কথা মনে করে রসজ্ঞান তারও নেই।"

পিঠ পিঠ জবাব এলো—

—"সত্য কথাকে যে রসিকতা মনে করে সত্যজ্ঞান তারও নেই।"

—"মানলুম। তারপর ওর সত্যিটি কোনখানে বুঝিয়ে দাও ত হে?"

—"বীরবলের কথাটা একবার উল্টে নেওয়া যাক্। তাহলে দাঁড়ায় এই যে—"ছোট গল্প হচ্ছে সেই পদার্থ, যা প্রথমত ছোট নয়, দ্বিতীয়ত গল্প নয়। তা যদি হয় ত, Kant-এর শুদ্ধ বুদ্ধির সুবিচারও ছোট গল্প।"

এ কথা শুনে আমরা অবশ্য হেসে উঠলুম, কিন্তু সুপ্রসন্ন আরও অপ্রসন্ন হয়ে বল্‌লেন—"তোমার যে রকম বুদ্ধি তাতে তোমার বাঙলা লেখক হওয়া উচিত। Nonsense-কে উল্টে নিলেই যে তা Sense হয় এ তত্ত্ব কোন্ লজিকে পেয়েছে, গ্রীক না জার্ম্মাণ? ছোট শব্দের নিজের কোনও অর্থ নেই, ও হচ্ছে একটা আপেক্ষিক শব্দ, অন্য কিছুর সঙ্গে মেপে না নিলে ওর মানে পাওয়া যায় না।"

—"তা'হলে War and Peace-এর চেহারা চোখের সুমুখে রাখ্‌লে Anna Karenina-কে ছোট গল্প বল্‌তে হবে। আর রাজসিংহের পাশে বসিয়ে দিলেই বিষবৃক্ষ ছোট গল্প হয়ে যাবে। একই কথার যে আলাদা আলাদা ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা মানে হয়, এইটে ভুলে গেলেই মানুষের মাথা ঘুলিয়ে যায়। গণিতে "ছোট" শব্দ relative ও লজিকে Correlative; কিন্তু সাহিত্যে তা positive."

—"তাহলে তোমার মতে ছোট গল্পের ঠিক মাপটা কি?"

—"এক ফর্ম্মা। যার দেহ এক ফর্ম্মায় আঁটে না, তা বড় গল্প না হতে পারে কিন্তু তা ছোট গল্প নয়।"

—"তোমার কথা গ্রাহ্য করবার পক্ষে বাধা হচ্ছে এই, যে ফর্ম্মাও সব এক মাপের নয়। ওর ভিতরও আট-পেজি, বারো-পেজি, ষোল-পেজি আছে।"

—"ছন্দও আট মাত্রার, বারো মাত্রার, ষোল মাত্রার হয়ে থাকে, অতএব যদি বলা যায় যে পদ্য ছন্দের সীমানা টপ্‌কে গেলে, তা গদ্য না হতে পারে কিন্তু তা পদ্য হয় না, তাহলে সে কথাও তোমাদের কাছে গ্রাহ্য নয়।"

সুপ্রসন্ন তর্কের এ পেঁচের কাটান হাতের গোড়ায় খুঁজে না পেয়ে বল্লেন—

—"আচ্ছা তা যেন হল। গল্প, গল্প হওয়া উচিত এ কথা বলে বীরবল কি তীক্ষ্ণ-বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন? আমরা জান্‌তে চাই গল্প কাকে বলে?"

প্রশান্ত অতি প্রশান্ত ভাবে উত্তর করলেন—

—"গল্প হচ্ছে সেই জিনিস যা আমরা কর্‌তে জানি নে।"

—"শুন্‌তে ত জানি?"

—"সে বিষয়েও আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। তোমরা ভালবাসো শুধু বর্ণনা আর বক্তৃতা, যার ভিতর গল্প ফোটা দূরে যাক্ শুধু চাপা পড়ে যায়। বড় গল্পের তোড়া বাঁধতে হলে হয়ত তার ভিতর দেদার পাতা পূরে দিতে হয়। কিন্তু ছোট গল্প হওয়া উচিত ঠিক একটি ফুলের মত, বর্ণনা ও বক্তৃতার লতাপাতার তার ভিতর স্থান নেই।"

—"দেখো প্রশান্ত, উপমা যুক্তি নয়। যারা উপমা দিয়ে কথা বলে, তাঁদের কাছ থেকে আমরা বস্তুর কোনও জ্ঞানলাভ করি নে, লাভ করি শুধু উপমারই জ্ঞান। তোমার ঐ ফুল পাতা রাখো, এখন বল দেখি, ছোট গল্পের প্রাণ কি?"

—"ট্রাজেডি।"

—"কেন কমেডি নয় কেন?"

—"এই কারণে, যে ট্রাজেডি অল্পক্ষণের মধ্যেই হয়ে যায়—যথা, খুন জখম মৃত্যু ইত্যাদি, আর কমেডির অভিনয় ত সারা জীবন ধরেই হচ্ছে।"

অমুকুল এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এইবার বল্‌লেন—

—"আমার মত ঠিক উল্টো। জীবনের অধিকাংশ মুহূর্ত্তই হচ্ছে কমিক। কিন্তু সেই মুহূর্ত্ত গুলোকেই এক সঙ্গে ঠিক দিলে তবে বোঝা যায় যে ব্যাপারটা আগাগোড়া ট্রাজিক। পৃথিবীতে যা ছোট তাই কমিক আর যা বড় তাই ট্রাজিক।"

"জীবনটা ট্রাজিক কি কমিক এ তর্ক উঠ্‌লে যে প্রথমে তা কমিক হবে আর শেষটা ট্রাজিক হতেও পারে এ কথা আমি জানতুম। তারপর ঐ ত হচ্ছে সকল দর্শনের আসল সমস্যা। আর কোনও দর্শনই অদ্যাবধি যখন তার মীমাংসা কর্‌তে পারে নি তখন আমরা যে হাত হাত তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করব, সে ভরসাও আমার ছিল না। আলোচনা, যুদ্ধ থেকে গল্পে এসে পড়ায় একটু হাঁপছেড়ে বেঁচে-ছিলুম, তাই দর্শনের একটা ঘোরতর তর্ক হতে নিষ্কৃতি পাবার জন্য আমি এই বলে উভয় পক্ষের আপোষ মীমাংসা করে দিলুম যে—'ট্রাজি-কমেডিই হচ্ছে ছোট গল্পের প্রাণ'। প্রফেসার এতক্ষণ আমাদের তর্কে যোগ দেন নি; নীরবে একমনে আমাদের কথা শুনছিলেন। অতঃপর তিনি ঈষৎ হাস্য করে বল্‌লেন—

—"প্রশান্তর কথা যদি ঠিক হয়, তাহলে ছোট গল্প আমারই লেখা উচিত, কেননা আমার মুখে গল্প ছোট হতে বাধ্য। আমার বর্ণনা করবার শক্তি নেই, আর বক্তৃতা করবার প্রবৃত্তি নেই। এই ত গেল প্রথম কথা। তারপর জীবনটাকে আমি ট্রাজেডিও মনে করি নে, কমেডিও মনে করি নে; কারণ আমার মতে সংসারটা হচ্ছে একসঙ্গে ও

দুই। ও দুই হচ্ছে একই জিনিসের এ-পিঠ আর ও-পিঠ। এখন আমার নিজের জীবনের একটী ঘটনা বল্‌তে যাচ্ছি। তোমরা দেখো প্রথমে তা ছোট হয় কি না, আর দ্বিতীয়ত তা গল্প হয় কি না। এই-টুকু ভরসা আমি দিতে পারি যে, তা ছাপ্‌লে আট পেজের কম হবে না, ষোলো পেজেরও বেশি হবে না—বারো পেজের কাছ ঘেঁসেই থাক্‌বে। তবে তা এক 'সবুজ পত্র' ছাড়া আর কোন কাগজ ছাপ্‌তে রাজি হবে কি না, বল্‌তে পারি নে। কেননা তার গায়ে ভাষার কোনও পোষাক থাক্‌বে না। ভাষা জিনিসটে যদি আমার ঠোঁটের গোড়ায় থাক্‌ত তাহলে আমি আঁকও কষ্‌তুম না, গল্পও লিখ্‌তুম না, ওকালতি কর্‌তুম। আর তাহলে আমার টাকারও এত টানাটানি হত না। সে যাহোক এখন গল্প শোনো।"

প্রফেসারের কথা।

আমি যে বছর B. Sc. পাশ করি সেই বছর পূজোর ছুটিতে বাড়ী গিয়ে জ্বরে পড়ি। সে জ্বর আর দু'তিন মাসের মধ্যে গা থেকে বেমালুম ঝেড়ে ফেল্‌তে পার্‌লুম না। দেখলুম, চণ্ডীদাসের অন্তরের গীরিতি বেয়াধির মত, আমার গায়ের জ্বর শুধু "থাকিয়া থাকিয়া জাগিয়া ওঠে জ্বালার নাহিক ওর।" শেষটা স্থির করলুম চেঞ্জে যাব। কোথায়, জানো?—উত্তরবঙ্গে! ম্যালেরিয়ার পিঠস্থানে। এর কারণ তখন বাবা সেখানে ছিলেন, এবং ভাল হাওয়ার চাইতে ভাল খাওয়ার উপর আমার বেশি ভরসা ছিল। এ বিশ্বাস আমার পৈতৃক। বাবার জীবনের প্রধান সখ ছিল আহার। তিনি ওষুধে বিশ্বাস করতেন

কিন্তু পথ্যে বিশ্বাস করতেন না, সুতরাং বাবার আশ্রয় নেওয়াই সঙ্গত মনে করলুম। জানতুম তাঁর আশ্রয়ে জ্বর বিষম হলেও সাবু খেতে হবে না।

একদিন রাত দুপুরে রাণাঘাট থেকে একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেণে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করলুম। মেল ছেড়ে প্যাসেঞ্জার ধরবার একটু কারণ ছিল। একে ডিসেম্বার মাস তার উপর আমার শরীর অসুস্থ তাই এক পাল অপরিচিত লোকের সঙ্গে ঘেঁসাঘেঁসি করে অতটা পথ যাবার প্রবৃত্তি হ'ল না। জানতুম যে প্যাসেঞ্জারে গেলে সম্ভবত একটা পুরো সেকেণ্ড ক্লাস কম্পার্টমেণ্ট আমার একার ভোগেই আসবে। আর তাও যদি না হয় ত গাড়ীতে যে লম্বা হয়ে শুতে পারব, আর কোনও গার্ড ড্রাইভার গোছের ইংরেজের সঙ্গে একত্র যে যেতে হবে না, এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলুম। এর একটা আশা ফলেছিল, আর একটা ফলে নি। আমি লম্বা হয়ে শুতে পেরেছিলুম কিন্তু ঘুমতে পাই নি। গাড়ীতে একটা বুড়ো সাহেব ছিল, সে রাত চারটে পর্য্যন্ত অর্থাৎ যতক্ষণ হোঁস ছিল, ততক্ষণ শুধু মদ চালালে। তার দেহের গড়নটা নিতান্ত অদ্ভুত, কোমর থেকে গলা পর্য্যন্ত ঠিক বোতলের মত। মদ খেয়েই তার শরীরটা বোতলের মত হয়েছে, কিম্বা তার শরীরটা বোতলের মত বলে মদ সে খায়, এ সমস্যার মীমাংসা আমি করতে পারলুম না। যারা দেহের গঠন ও ক্রিয়ার সম্বন্ধ নির্ণয় করে, এ Problem-টা তাদের জন্য, অর্থাৎ ফিজিওলজিস্টদের জন্য রেখে দিলুম। যাক্ এ সব কথা। আমার সঙ্গে বৃদ্ধটি কোনরূপ অভদ্রতা করে নি, বরং দেখবামাত্রই আমার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হয়ে, সে ভদ্রলোক একটা মাখামাখি করবার চেষ্টা করেছিল, যে আমি জেগে থেকেও ঘুমিয়ে পড়বার ভাণ করলুম। মাতাল আমি

পূর্ব্বে কখনও এত হাতের গোড়ায়, আর এতক্ষণ ধরে দেখি নি, সুতরাং এই তার খাঁটি নমুনা কি না বলতে পারি নে। সে ভদ্রলোক পালায় পালায় হাসছিল ও কাঁদছিল। হাসছিল—বিড় বিড় করে কি বকে, আর কাঁদছিল, পরলোকগতা সহধর্ম্মিণীর গুণ কীর্ত্তন করে। সে যাত্রা গাড়ীতে প্রথমেই মানব-জীবনের এই ট্রাজি-কমেডির পরিচয় লাভ করলুম। আমার পক্ষে এই মাতলামির অভিনয়টা কিন্তু ঠিক কমেডি বলে' বোধ হয় নি। দুর্ব্বল শরীরে শীতের রাত্তিরে রাত্রি-জাগরণটা ঠাট্টার কথা নয়, বিশেষত সে জাগরণের অংশীদার যখন এমন লোক যার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে মদের গন্ধ অবিরাম ছুটছে। মানুষ যখন ব্যারাম থেকে সবে সেরে ওঠে তখন তার সকল ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ হয়, বিশেষত ঘ্রাণেন্দ্রিয়। আমারও তাই হয়েছিল। ফলে জ্বর আসবার মুখে যে রকম গা পাক দেয়, মাথা ধোরে আমার ঠিক সেই রকম হয়েছিল। ঘ্রাণে যে অর্দ্ধ ভোজনের ফল হয় এ সত্যের সে রাত্তিরে আমি নাকে মুখে প্রমাণ পাই।

পরদিন ভোরের বেলায় শীতে হি হি করতে করতে ষ্টীমারে পদ্মা পার হলুম। সারায় গিয়ে এবার যে গাড়ীতে চড়লুম তাতে জনপ্রাণী ছিল না। আগের রাত্তিরের পাপ সেইখানেই বিদেয় হল। মনে মনে বললুম বাঁচলুম। যদিচ বিনা নেশায় মানুষটা কি রকম তা দেখবার ঈষৎ কৌতূহল ছিল। সাদা চোখে হয়ত সে আমার দিকে কটমটিয়ে চাইত। শুনেছি নেশার অনুরাগ খোঁয়ারিতে রাগে দাঁড়ায়। সে যাই হোক, গাড়ী চলতে লাগল, কিন্তু সে এমনি ভাবে যে, গম্যস্থানে পৌঁছবার জন্য যেন তার কোনও তাড়া নেই। ট্রেণ প্রতি ষ্টেশনে থেমে জিরিয়ে, একপেট জল খেয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে ধীরে সুস্থে ঘটর ঘটর করে' অগ্রসর হতে লাগল। আমি সাহিত্যিক হ'লে, এই

ফাঁকে উত্তর-বঙ্গের মাঠ-ঘাট, জল-বায়ু, গাছপালার একটা লম্বা বর্ণনা লিখতে পারতুম। কিন্তু সত্যিকথা বল্‌তে গেলে, আমার চোখে এ সব কিছুই পড়ে নি; আর যদি পড়ে থাকে ত মনে কিছুই ঢোকে নি, কেননা কি যে দেখেছিলুম তার বিন্দু বিসর্গ কিছুই মনে নেই। মনে এইমাত্র আছে যে, আমি গাড়ীতে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। একটা গোলমাল শুনে জেগে উঠে দেখি, গাড়ী হিলি ষ্টেশনে পৌঁচেছে—আর বেলা তখন একটা।

চোখ তাকিয়ে দেখি, একদল মুটে হুড়মুড় করে এসে গাড়ীর ভিতর ঢুকে এক রাশ বাক্স ও তোরোঙ্গে ঘর ছেয়ে ফেল্‌লে। সেই সব বাক্স ও তোরঙ্গের উপর বড় বড় কালির অক্ষরে লেখা ছিল Mr. A. Day. দেখে আমার প্রাণে ভয় ঢুকে গেল, এই মনে করে, যে রাত্‌টে ত একটা সাহেবে জ্বালিয়েছে দিনটা হয়ত আর একটা সাহেবে জ্বালাবে, সম্ভবত বেশিই জ্বালাবে, কেননা আগন্তুক যে সরকারি সাহেব তার সাক্ষী, তাঁর চাপ্‌রাশ ধারী পেয়াদা, সুমুখেই হাজির ছিল। আমি ভয়ে ভয়ে বেঞ্চির এক কোণে জড়সড় হয়ে বসলুম। স্বীকার করছি আমি বীরপুরুষ নই।

অতপর যিনি কামরায় প্রবেশ করলেন তাঁকে দেখে আমি ভীত না হই চকিত হয়ে গেলুম। তাঁর নাম মিষ্টার Day না হয়ে মিষ্টার Night হলেই ঠিক হ'ত। আমরা বাঙালীরা শুনতে পাই মোঙ্গল° দ্রাবিড় জাত। কথাটা সম্ভবত ঠিক, কেননা আমাদের অধিকাংশ লোকের চেহারায় মঙ্গোলিয়ানের রঙের বেশ একটু আমেজ আছে। কিন্তু পাকা মাদ্রাজি রঙ শুধু দু'চার জনের মধ্যেই পাওয়া যায়। Mr. Day সেই দু'চার জনের একজন। আমি কিন্তু তার রঙ দেখে অবাক

হই নি, চেহারা দেখে চম্‌কে গিয়েছিলুম। এ দেশে ঢের শ্যামবর্ণ লোক আছে যারা অতি সুপুরুষ, কিন্তু এই হ্যাটকোট ধারী যে কোন জাতীয় জীব তা বলা কঠিন। মানুষের সঙ্গে ভাঁটার যে কতটা সাদৃশ্য থাকতে পারে ইতিপূর্ব্বে তার চাক্ষুস পরিচয় কখনই পাই নি। সেই দৈর্ঘ্য প্রস্থে প্রায় সমান লোকটির, গা হাত পা মাথা চোখ গাল সবই ছিল গোলাকার। তারপর তাঁর সর্ব্বাঙ্গ তাঁর কোট পেণ্টালুনের ভিতর দিয়ে ফেটে বেরুচ্ছিল। কোট পেণ্টালুন, কাপড়ের,—তাঁর দেহ যে তাঁর চামড়া ফেটে বেরয় নি, এই আশ্চর্য্য। তাঁকে দেখে আমার শুধু কোলাবেঙের কথা মনে পড়তে লাগল, আর আমি হাঁ করে তাঁর দিকে চেয়ে রইলুম। যা অসামান্য তাই মানুষের চোখকে টানে, তা সে সু-রূপই হোক্ আর কু-রূপই হোক। একটু পরেই আম'র হোঁস হল, যে ব্যবহারটা আমার পক্ষে অভদ্রতা হচ্ছে। অমনি আমি তাঁর সুগোল নিটোল বপু থেকে চোখ তুলে নিয়ে অন্য দিকে চাইলুম। অন্ধকারের পর আলো দেখলে লোকের মন যেমন এক নিমিষে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, আমারও ঠিক তাই হল। এবার যা চোখে পড়ল, তা সত্য সত্যই আলো—সে রূপ, আলোর মতই উজ্জ্বল, আলোর মতই প্রসন্ন। Mr. Day-র সঙ্গে দুটি কিশোরীও যে গাড়ীতে উঠেছিলেন, প্রথমে তা লক্ষ্য করি নি। এখন দেখলুম তার একটি Mr. Day-র ঈষৎ সংক্ষিপ্ত শাড়ী বাঁধাই সংস্করণ। এর বেশি আর কিছু বল্‌তে চাইনে। Weismann যাই বলুন বাপের রূপ সন্তানে বর্ত্তায়, তা সে-রূপ সোপার্জ্জিতই হোক আর অন্বয়াগতই হোক। অপরটির রূপ বর্ণনা করা আমার পক্ষে অসাধ্য; কেননা আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে, আমার চোখে ও মনে সেই মুহূর্ত্তে যা চিরদিনের মত ছেপে গেল, সে হচ্ছে

একটা আলোর অনুভূতি। এর বেশি আমি আর কিছু বল্‌তে পারি নে। আমি যদি চিরজীবন আঁক না কষে কবিতা লিখ্‌তুম, তাহলে হয়ত তার চেহারা কথায় এঁকে তোমাদের চোখের সুমুখে ধরে দিতে পারতুম। আমার মনে হল সে আপাদ-মস্তক বিদ্যুৎ দিয়ে গড়া, তার চোখের কোণ থেকে, তার আঙ্গুলের ডগা দিয়ে, অবিশ্রান্ত বিদ্যুৎ ঠিক্‌রে বেরুচ্ছিল। Leyden Jar-এর সঙ্গে স্ত্রীলোকের তুলনা দেওয়াটা যদি সাহিত্যে চল্‌ত, তা'হলে ঐ এক কথাতেই আমি সব বুঝিয়ে দিতুম। সাদা কথায় বল্‌তে গেলে, প্রাণের চেহারা তার চোখ-মুখ তার অঙ্গ-ভঙ্গী তার বেশভূষা সকলের ভিতর দিয়ে অবাধে ফুটে বেরচ্ছিল। সেই একদিনের জন্য আমি বিশ্বাস করেছিলুম যে, অধ্যাপক জে, সি, বোসের কথা সত্য,—প্রাণ আর বিদ্যুৎ একই পদার্থ।

এই উচ্ছ্বাস থেকে তোমরা অনুমান করছ, যে আমি প্রথম দর্শনেই তার ভালবাসায় পড়ে গেলুম। ভালবাসা কাকে বলে তা জানি নে, তবে এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি, যে সেই মুহূর্ত্তে আমার বুকের ভিতর একটি নূতন জানালা খুলে গেল, আর সেই দ্বার দিয়ে আমি একটা নূতন জগত আবিষ্কার করলুম, যে জগতের আলোয় মোহ আছে, বাতাসে মদ আছে। এই থেকেই আমার মনের অবস্থা বুঝতে পার্‌বে। আমার বিশ্বাস আমি যদি কবি হতুম তা'হলে তোমরা যাকে ভালবাসা বলো, তা আমার মনে অত শীগ্‌গির জন্মাতো না। যারা ছেলেবেলা থেকে কাব্যচর্চ্চা ক'রে তারা ও জিনিসের টাকে নেয়। আমাদের মত চিরজীবন আঁক-কষা লোকদেরই ও রোগ চট্ করে পেয়ে বসে। মাপ করো, একটু বক্তৃতা করে ফেল্‌লুম, তোমাদের কাছে সাফাই হবার জন্য। এখন শোনো তারপর কি হল।

Mr. Day আমার সঙ্গে কথপোকথন সুরু করে দিলেন এবং সেই ছলে আমার আদ্যোপান্ত পরিচয় নিলেন। মেয়ে দুটি আমাদের কথা-বার্ত্তা অবশ্য শুন্‌ছিল, স্থূলাঙ্গীটি মনোযোগ সহকারে, আর অপরটি আপাতদৃষ্টিতে—অন্যমনস্ক ভাবে। আমি আপাতদৃষ্টিতে বল্‌ছি এই কারণে যে, এ আমার এক একটা কথায় তার চোখের হাসি সাড়া দিচ্ছিল। আমার নাম কিশোরীরঞ্জন, এ কথা শুনে বিদ্যুৎ তার চোখের কোণে চিক্‌মিক্ করতে লাগল, তার ঠোঁটের উপর লুকোচুরি খেল্‌তে লাগল। স্থূলাঙ্গীটি কিন্তু আসল কাজের কথাগুলো হাঁ করে গিল্‌ছিল। আমার বাবা যে পাটের কারবার করেন, আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কামারা ছেলে তারপর অবিবাহিত, তারপর জাতিতে কায়স্থ, এ খবর গুলো বুঝলুম সে তার বুকের নোট বুকে টুকে নিচ্ছে। আমাদের সাংসারিক অবস্থা যে কি রকম, সে কথা জিজ্ঞাসা করবার বোধ হয় Mr. Day-র প্রয়োজন হয় নি। হয়ত তিনি আমার বাবাকে নামে জান্‌তেন, নয়ত তিনি আমার বেশভূষার পারিপাট্য, আসবাবপত্রের আভিজাত্য থেকে অনুমান করতে পেরেছিলেন, যে আমাদের সংসারে আর যে বস্তুরই অভাব থাক্—অন্নবস্ত্রের অভাব নেই। সুতরাং আমি বাবার এক ছেলে ও ফার্ষ্ট ডিভিসনে B. Sc. পাশ করেছি, এ সংবাদ পেয়ে তিনি আমার প্রতি হঠাৎ অতিশয় অনুরক্ত হয়ে পড়্‌লেন। আগের রাত্তিরে বুড়ো সাহেবটি যে পরিমাণ হয়েছিলেন তার চাইতে এক চুল কম নয়। মদ যে এ দুনিয়ায় কত রকমের আছে, এ যাত্রায় তার জ্ঞান আমার ক্রমে বেড়ে যেতে লাগল।

এর পর তাঁর পরিচয় তিনি নিজে হতেই দিলেন। সে পরিচয় তিনি খুব লম্বা করে দিয়েছিলেন, আমি তা দু' কথায় বল্‌ছি। তিনিও

কায়স্থ, তিনিও B. A. পাশ। এখন তিনি গভর্ণমেণ্টের একজন বড় চাকুরে—Settlement Officer। কিন্তু যে কথা তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার করে বলেছিলেন, সে হচ্ছে এই যে, তিনি বিলেত-ফেরৎ নন, ব্রাহ্মও নন, পাকা হিন্দু; তবে তিনি শিক্ষিত লোক বলে স্ত্রী-শিক্ষায় বিশ্বাস করেন এবং বাল্য-বিবাহে বিশ্বাস করেন না। সংক্ষেপে তিনি reformer নন—reformed Hindu। মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, জুতো মোজা পরতে শিখিয়েছেন, এবং এই সব শিক্ষা দেবার জন্য বড় করে রেখেছেন, এতদিনও বিবাহ দেন নি। তবে পয়লা নম্বরের পাশকরা ছেলে পেলে এখন মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি আছেন। একথা শুনে আমি তার দিকে চাইলুম, কার দিকে অবশ্য বলবার দরকার নেই। অমনি তার মুখে আলো ফুটে উঠ্‌ল, কিন্তু তার ভিতর কি যেন একটা মানে ছিল, যা আমি ঠিক ধরতে পারলুম না। আমার মনে হল সে আলোর অন্তরে ছিল অপার রহস্য, আর অগাধ মায়া। এক কথায়, আরতির আলোতে প্রতিমার চেহারা যে রকম দেখায়—সেই হাসির আলোতে তার চেহারা ঠিক তেমনি দেখাচ্ছিল। শরীর যার রুগ্ন সে পরের মায়া চায় এবং একটুতেই মনে করে অনেকখানি পায়। এই সূত্রে আমি একটা মস্তবড় সত্য আবিষ্কার করে ফেল্‌লুম, সে হচ্ছে এই যে, স্ত্রীলোকে বলকে ভক্তি করে কিন্তু ভালবাসে দুর্ব্বলকে।

সে যাই হোক, আমি মনে মনে তার গলায় মালা দিলুম, আর তার আকার ইঙ্গিতে বুঝ্‌লুম, সেও তার প্রতিদান কর্‌লে। এই মানসিক গান্ধর্ব্ব বিবাহকে সামাজিক ব্রাহ্ম বিবাহে পরিণত কর্‌তে যে বৃথায় কালক্ষেপ করব না, সে বিষয়েও কৃতসংকল্প হলুম। দুটির মধ্যে

সুন্দরীটিই যে বয়ঃজ্যেষ্ঠা সে বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ ছিল না। যদি জিজ্ঞাসা করো যে, দুই বোনের ভিতর চেহারার প্রভেদ এত বেশি কেন? তার উত্তর—একটি হয়েছে মায়ের মত আর একটি বাপের মত। এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে অবশ্য আমাকে differential calculas-এর আঁক কষতে হয় নি।

আমি ও মিষ্টার দে দুজনেই হল্‌দিবাড়ী নামলুম। দে সাহেবের ঐ ছিল কর্ম্মস্থল এবং বাবাও তাঁর ব্যবসার কি তদ্বিরের জন্য সে সময়ে ঐখানেই উপস্থিত ছিলেন। ষ্টেসনে যখন আমি দে সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছি—তখন সেই সুন্দরীর দিকে চেয়ে দেখি, সে মুখে হাসির রেখা পর্য্যন্ত নেই। যে চোখ এতক্ষণ বিদ্যুতের মত চঞ্চল ছিল, সে চোখ এখন তারার মত স্থির হয়ে রয়েছে, আর তার ভিতরে কি একটা বিষাদ, একটা নৈরাশ্যের কালো ছায়া পড়েছে। সে দৃষ্টি যখন আমার চোখের উপর পড়ল, তখন আমার মনে হল, তা যেন স্পষ্টাক্ষরে বল্‌লে "আমি এ জীবনে তোমাকে আর ভুলতে পারব না; আশা করি তুমিও আমাকে মনে রাখবে।" মানুষের চোখে যে কথা কয় একথা আমি আগে জানতুম না। অতঃপর আমি চোখ নীচু করে সেখান থেকে চলে এলুম।

তারপর যা হ'ল, শোনো। আমি এ বিয়েতে বাবার মত করালুম। আমি তাঁর একমাত্র ছেলে, তার উপর আবার ভালো ছেলে; সুতরাং বাবা আমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে দ্বিধা কর্‌লেন না। প্রস্তাবটা অবশ্য বরের পক্ষ থেকেই উত্থাপন করা হল। উভয় পক্ষের ভিতর মামুলি কথাবার্ত্তা চল্‌ল। তারপর আমরা একদিন সেজেগুজে মেয়ে দেখতে

গেলুম। মেয়ে আমি আগে দেখ্‌লেও বাবা ত দেখেন নি। তা ছাড়া রীত রক্ষে বলেও ত একটা জিনিস আছে।

দে সাহেবের বাড়ীতে আমরা উপস্থিত হবার পর, খানিকক্ষণ বাদেই একটি মেয়েকে সাজিয়ে গুজিয়ে আমাদের সুমুখে এনে হাজির করা হল। সে এসে দাঁড়াবামাত্র আমার চোখে বিদ্যুতের আলো নয় বুকে বিদ্যুতের ধাক্কা লাগ্‌ল। এ সে নয়—অন্যটি। সাজগোজের ভিতর তার কদর্য্যতা জোর করে ঠেলে বেরিয়েছিল। আমি যদি তার সেদিনকার মূর্ত্তির বর্ণনা করি, তাহলে নিষ্ঠুর কথা বলব। তার কথা তাই থাক্। আমি এ ধাক্কায় এতটা স্তম্ভিত হয়ে গেলুম যে, কাঠের পুতুলের মত অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। পর্দ্দার আড়াল থেকে পাশের ঘরে একটি মেয়ে বোধহয় আমার ঐ অবস্থা দেখে খিল খিল করে হেসে উঠ্‌ল। আমার বুঝ্‌তে বাকী রইল না—সে হাসি কার। আমি যদি কবি হতুম—তাহলে সেই মুহূর্ত্তে বলতুম "ধরণী দ্বিধা হও আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি।"

ব্যাপার কি হয়েছিল জানো, যে মেয়েটিকে আমাকে দেখানো হয়েছিল, সে হচ্ছে দে-সাহেবের অবিবাহিতা কন্যা আর যাকে পর্দ্দার আড়ালে রাখা হয়েছিল সে হচ্ছে দে বাহাদুরের বিবাহিতা স্ত্রী, অবশ্য দ্বিতীয় পক্ষের। বলা বাহুল্য আমি এ বিবাহ করতে কিছুতেই রাজি হলুম না, যদিচ বাবা বিরক্ত হলেন, দে-সাহেব রাগ করলেন, আর দেশশুদ্ধ লোক আমার নিন্দা কর্‌তে লাগ্‌ল।

এ ঘটনার হপ্তা খানেক বাদে ডাকে একখানি চিঠি পেলুম। লেখা স্ত্রী-হস্তের। সে চিঠি এই—

"যদি আমার প্রতি তোমার কোনরূপ মায়া থাকে, তাহলে তুমি ঐ বিবাহ করো, নচেৎ এ পরিবারে আমার তেষ্টানো ভার হবে।

কিশোরী—

এ চিঠি পেয়ে আমার সংকল্প ক্ষণিকের জন্য টলেছিল; কিন্তু ভেবে দেখ্‌লুম ও কাজ করা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। কেননা দুজনেই এক ঘরের লোক এবং দুজনের সঙ্গেই আমার সম্বন্ধ রাখ্‌তে হবে এবং সে দুই মিথ্যাভাবে। নিজের মন যাচিয়ে বুঝলুম, চিরজীবন এ অভিনয় করা আমার পক্ষে অসাধ্য। এই হচ্ছে আমার গল্প—এখন তোমরা স্থির কর যে, এ ট্রাজেডি, কি কমেডি, কিম্বা এক সঙ্গে ও দুই।

প্রফেসর এই বলে থাম্‌লে, অনুকূল হেসে বল্‌লে—

—"অবশ্য কমেডি। ইংরাজিতে যাকে বলে Comedy of Errors."

প্রশান্ত গম্ভীর ভাবে বল্‌লেন—

—"মোটেই নয়, এ শুধু ট্রাজেডি নয় একেবারে চতুরঙ্গ ট্রাজেডি।"

ঐ চতুরঙ্গ বিশেষণের সার্থকতা কি প্রশ্ন করাতে তিনি উত্তর কর্‌লেন,—

—"স্ত্রী কিশোরী আর প্রোফেসার কিশোরী এই দুই কিশোরীর পক্ষে ব্যাপারটা যে কি ট্রাজিক তা ত সকলেই বুঝ্‌তে পার্‌ছ। আর এটা বোঝাও শক্ত নয়, যে দে-সাহেবের মনের শান্তিও চিরদিনের জন্য নষ্ট হয়ে গেল, আর তাঁর মেয়ের হয় আর বিয়ে হল না, নয় কোনও বাঁদরের সঙ্গে হ'ল।"

প্রফেসর এর জবাবে বল্‌লেন, "শ্রীমতীর জন্য দুঃখ করবার

কিছু নেই, তার আমার চাইতে ঢের ভাল বরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। তার স্বামী এখন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, আর সে আমার দ্বিগুণ মাইনে পায়। কথাটা হয় ত তোমরা বিশ্বাস করছ না কিন্তু ঘটনা তাই। দে বাহাদুর দশ হাজার টাকা পণ দিয়ে একটি M. A.-এর সঙ্গে তার বিবাহ দেন, তার পরে সাহেব সুবোকে ধরে, তাকে ডেপুটি করে দেন। আমার সঙ্গে বিয়ে হলে তাকে খালি পায়ে বেড়াতে হ'ত, এখন সে দু'বেলা জুতো মোজা পরছে। তার পর বলা বাহুল্য, যে দে-বাহাদুরের যে রকম আকৃতি প্রকৃতি, তাতে করে তিনি ট্রাজেডি দূরে থাক কোনও কমেডিরও নায়ক হতে পারেন না, তাঁর যথার্থ স্থান হচ্ছে প্রহসনের মধ্যে।"

—"আচ্ছা তা হলে তোমাদের দুজনের পক্ষে ত ঘটনাটা ট্রাজিক?"

—"কি করে জানলে? অপর কিশোরীর বিষয় ত তুমি কিছুই জানো না, আর আমার মনের খবরই বা তুমি কি রাখো?"

—"আচ্ছা ধরে নিচ্ছি যে, অপরটির পক্ষে ব্যাপারটা হয়েছে comedy, খুব সম্ভবত তাই—কেননা তা নইলে তোমার দুর্দ্দশা দেখে সে খিল খিল করে হেসে উঠ্‌বে কেন? কিন্তু তোমার পক্ষে যে এটা ট্রাজেডি, তার প্রমাণ, তুমি অদ্যাবধি বিবাহ করো নি।"

—"বিবাহ করা আর না করা, এ দুটোর মধ্যে কোন্‌টা বড় ট্রাজেডি তা যখন জানিনে, তখন ধরে নেওয়া যাক—করাটাই হচ্ছে comedy." যদিচ বিবাহটা কমেডির শেষ অঙ্ক বলেই নাটকে প্রসিদ্ধ। সে যাই হোক্ আমি যে বিয়ে করি নি তার কারণ—টাকার অভাব।

—"বটে! তুমি যে মাইনে পাও তাতে আর দশজন ছেলে পিলে নিয়ে ত দিব্যি ঘর সংসার করছে।"

—"তা ঠিক। আমার পক্ষে তা করা কেন সম্ভব নয়, তা বলছি। বছর কয়েক আগে বোধ হয় জানো, যে, পাটের কারবারে একটা বড় গোছের মার খেয়ে বাবার ধন ও প্রাণ দুই এক সঙ্গে যায়। ফলে আমরা একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ি। তারপর এই চাকুরিতে ঢুকে মা'র অনুরোধে বিয়ে করতে রাজি হলুম। ব্যাপারটা অনেক দূর এগিয়ে এসেছিল, আমি অবশ্য মেয়ে দেখি নি কিন্তু পাকা দেখাও হয়ে গিয়েছিল। এমন সময়ে আবার এক খানি চিঠি পেলুম, লেখা সেই স্ত্রী হস্তের। সে চিঠির মোদ্দা কথা এই যে, লেখিকা বিধবা হয়েছেন এবং সেই সঙ্গে কপর্দ্দক শূন্য। দে-সাহেব তাঁর উইলে তাঁর স্ত্রীকে এক কড়াও দিয়ে যান নি। তাঁর চিরজীবনের সঞ্চিত ঘুষের টাকা তিনি তাঁর কন্যারত্নকে দিয়ে গিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে খোরপোষের মামলা করা কর্ত্তব্য কি না, সে বিষয়ে তিনি আমার পরামর্শ চেয়ে ছিলেন। আমি প্রত্যুত্তরে মামলা করা থেকে নিবৃত্ত করে, তাঁর সংসারের ভার নিজের ঘাড়ে নিয়েছি। ভেবে দেখো দেখি, যে গল্পটা তোমাদের বললুম, সেটা আদালতে কি বিশ্রী আকারে দেখা দিত। বলা বাহুল্য, এর পর আমার বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিলুম, মা বিরক্ত হলেন, কন্যা পক্ষ রাগ করলেন, দেশশুদ্ধ লোক নিন্দে করতে লাগল কিন্তু আমি তাতে টল্‌লুম না। কেননা দু'সংসার চালাবার মত রোজগার আমার নেই।

—"দেখো তুমি অদ্ভুত কথা বলছ, একটি হিন্দু বিধবার আর কি লাগে, মাসে দশ টাকা হলেই ত চলে যায়, তা আর তুমি দিতে পারো না?"

—"যদি দশ টাকায় হতো তাহলে আমি পাকা দেখার পর বিয়ে

ভেঙ্গে দিয়ে সমাজে দুর্গামেরভাগী হতুম না। সে একা নয়, তার বাপ মা আছে, তারা যে হতদরিদ্র তা বোধ হয়, তাদের দে-সাহেবকে কন্যাদান থেকেই বুঝতে পারো। তারপর আমি যে ঘটনার উল্লেখ করেছি তার সাত মাস পরে তার যে কন্যাসন্তান হয় সে এখন বড় হয়ে উঠ্‌ছে। এই সবকটির অন্নবস্ত্রের সংস্থান আমাকেই কর্‌তে হয়, আর তা অবশ্য দশ টাকায় হয় না।"

অনুকূল জিজ্ঞাসা করলেন,—

—"তার রূপ আজও কি আলোর মত জ্বল্‌ছে?"

—"বল্‌তে পারি নে, কেননা তার সঙ্গে সেই ট্রেণে ছাড়া আমার আর সাক্ষাৎ হয় নি।"

—"কি বল্‌ছ, তুমি তার গোনাগুন্তি খাইয়ে পরিয়ে রাখ্‌ছ আর সে তোমার সঙ্গে একবারও সাক্ষাৎ করে নি?"

—"একবার কেন, বহুবার সাক্ষাৎ কর্‌তে চেয়েছিল কিন্তু আমি করি নি।"

অনুকূল হেসে বল্‌লে, "পাছে 'নেশার অনুরাগ খোঁয়ারির রাগে পরিণত হয়' এই ভয়ে বুঝি?"

—"না তার কন্যাটি পাছে তার দিদির মত দেখ্‌তে হয় এই ভয়ে!"

শেষে আমি বল্‌লুম, "প্রফেসার তোমার গল্প উৎরেছে। তুমি করতে চাইলে বিয়ে তা হ'ল না, কিন্তু বিয়ের দায়টা পড়্‌ল তোমার ঘাড়ে। এ ব্যাপার যদি ট্রাজি-কমেডি না হয়, ত ট্রাজি-কমেডি কাকে বলে তা আমি জানি নে"।

সুপ্রসন্ন বল্‌লে—

—"তা হতে পারে, কিন্তু এ গল্প ছোট গল্প হয় নি, কেননা, এতক্ষণে ষোলপেজ পেরিয়ে গেল।"

প্রশান্ত অমনি বলে উঠল যে—

"তা যদি হয়ে থাকে ত সে প্রফেসারের গল্প বলার দোষে নয়—তোমাদের জেরা আর সওয়াল জবাবের গুণে।"

প্রফেসার হেসে বল্‌লেন—"প্রশান্ত যা বল্‌ছে তা ঠিক, শুধু "তোমাদের" বদলে "আমাদের" ব্যবহার কর্‌লে তার বক্তব্যটা ব্যাকরণ শুদ্ধ হত।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

"এত্তো বড়" কিম্বা "কিছু নয়"।

—*—

(১)

আমার একটি আড়াই বছরের ভ্রাতুষ্পুত্র আছেন যাঁর নাম, "ছোট-কালী বাবু।" তিনি যে লোককে চেনেন না, তাকে বলেন—"কেউ নয়," আর যে জিনিষ জানেন না তাকে বলেন—"কিছু নয়।" যখন শুনি, আমাদের পলিটিক্সের একদল বলছেন, Reform-scheme "কিছু নয়," তখন আমার ছোট কালী বাবুর কথা মনে পড়ে যায়।

(২)

আমর ভ্রাতুষ্পুত্রটির আর একটি গুণ আছে। কোন জিনিষ তাঁর হাতে এলে, তিনি বুক ফুলিয়ে এবং গলা মোটা করে বলেন, "এত্তো বড়"—তা সে বস্তু যতই ছোট হো'ক। যখন শুনি আমাদের পলিটিক্সের আর এক দল বলছেন, Reform-scheme, "এত্তো বড়," তখনও আমার ছোট কালী বাবুর কথা মনে পড়ে।

(৩)

পলিটিক্সের জগতে, আমরা আজও সাবালক হই নি, কিন্তু তাই বলে আমাদের পলিটিক্সের বড়বাবুরা যে সব ছোট কালী বাবু এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। সুতরাং এঁদের এই সব মৎফরাক্কা মত প্রকাশের নিশ্চয়ই অপর কারণ আছে।

(৪)

সে কারণ হচ্ছে "যুদ্ধজ্বর।" Reform-scheme-ও বার হ'ল, আর সঙ্গে সঙ্গে দেশে যুদ্ধজ্বরও এসে পড়্‌ল। এ জ্বরে ধরলে মানুষে বেহোঁস হয়। সুতরাং এই জ্বরের প্রকোপে উক্ত Scheme সম্বন্ধে যা বলা কওয়া হয়েছে, তা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। কেন না সে সময়ে বক্তাদের কারও মাথার ঠিক ছিল না।

(৫)

এ জ্বর যে আমাদের পলিটিসিয়ানদের গায়েই বেশি করে ফুটে উঠে ছিল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে,—Bengal Provincial Conference-এর সেদিনকার অধিবেশনে। সে সভার temperature সেদিন দেখ্‌তে দেখ্‌তে ১০৫ ডিগ্রীর উপরে উঠে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, সে ক্ষেত্রে কারও কারও জ্বর যে বিকারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া গেছে—তাঁদের বক্তৃতায়। শুনতে পাই এদেশের জনৈক অতি-বক্তা নাকি বলেছিলেন, যে "স্বরাজ" তিনি President Wilson-এর কাছে চেয়ে নেবেন। এ রকম প্রলাপ অবশ্য বাংলা দেশে কেউ সজ্ঞানে বক্‌তে পারে না, কেননা বাঙালীতে ও কাঙালীতে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে।

(৬)

এই যুদ্ধজ্বরের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই দেখ্‌তে পাচ্ছি দু-দলেরই মাথা অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। যাঁরা আগে বলেছিলেন 'কিছু নয়', তাঁরা এখন বলছেন, 'না, কিছু বটে', আর যাঁরা আগে বলেছিলেন

'এত্তো বড়,' তাঁরা এখন বলছেন—'না ত্যাত্তো বড় নয়'। এখন যদি উভয় পক্ষ একত্র হয়ে এ বিষয়ে হিসাব মোকাবিলা করেন, ত আমার বিশ্বাস উভয় পক্ষই দেখ্‌তে পাবেন যে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে বিশেষ কোনও গরমিল নেই। সুতরাং বামমার্গ এবং দক্ষিণ মার্গের পলিটিসিয়ানদের নিকট আমাদের সানুনয় অনুরোধ এই যে, তাঁরা এই ফাঁকে তাঁদের আড়া-আড়ির তাড়াতাড়ি একটা আপোষ মীমাংসা করে নিন্। এ সুযোগ কোন পক্ষেরই হারানো উচিত নয়, কেননা যুদ্ধ-জ্বরের আবার relapse হয় এবং তা হলে, ব্যাপার হয়ে ওঠে একেবারে মারাত্মক।

(৭)

কিন্তু আমাদের এ প্রার্থনায় কোন পক্ষ যে কর্ণপাত কর্‌বেন, সে বিষয়ে বড় একটা ভরসা নেই। এঁরা বল্‌বেন, পলিটিক্স শুধু হিসেব নিকেশের কথা নয়, ও হচ্ছে আসলে হৃদয়ের কথা। যাদের মধ্যে বুকের মিল নেই, তাদের মধ্যে মুখের মিল কদিন থাক্‌বে?

(৮)

হৃদয়ের দোহাই দিলে এ দেশে নির্ব্বুদ্ধিতার সাতখুন মাপ। হৃদয়টা আমাদের দেশে "এত্তো বড়" জিনিষ। যার মাথা নেই তার মাথা-ব্যথার কথা শুন্‌লে আমরা অবশ্য হাসি কিন্তু যার বুক নেই তার বুকের ব্যাথার কথা শুন্‌লে আমরা কাঁদি। এই আমাদের স্বভাব, আর এই জন্যেই ত এদেশে কোনও কাজের কথা বলা এত কঠিন। হৃদয় পদার্থটা অবশ্য খুব ভাল জিনিষ; এবং উদরের চাইতে ঢের উঁচুদরের জিনিষ এবং উদর যে অনেক ক্ষেত্রে নিজেকে মস্তক বলে পরিচয় দিতে চায়, তাও অস্বীকার করবার যো নেই। কিন্তু মস্তকের সঙ্গে হৃদয়ের একটা

মস্তপ্রভেদ আছে। মানুষের মাথায় দুটো চোখ আছে, বুকে একটাও নেই। হৃদয় অন্ধ, অতএব যে যত অন্ধ সে যে তত হৃদয়বান এই হচ্ছে লোকমত। এ মতের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা, কেননা সে তর্ক লোকে কানে তুল্‌বে না। এ কথা কে না জানে যে, "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর"।

(৯)

তবে কৃষ্ণ-প্রাপ্তি ও স্বরাজ-প্রাপ্তির উপায় এক কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবসর আছে। তারপর পলিটিক্সে আমরা যাকে হৃদয়াবেগ বলি, সে চাঞ্চল্যের মূল হৃদয়ে কি মস্তকে তাও ঠিক জানা নেই। আমরা যে আজ তিনপুরুষ ধরে পলিটিক্সের বিলিতি মদ্য পান করে আস্‌ছি সে কথা ত আর অস্বীকার করা চলে না। সুতরাং আমাদের এই পলিটিকাল ছট্‌ফটানির মূলে হৃদয়ের লালরক্তই বা কতখানি আছে আর বিলাতের লালপানীই বা কতখানি আছে,—অর্থাৎ বুকের ব্যাথাই বা কতখানি আছে, আর বইয়ের কথাই বা কতখানি আছে তা কে জোর করে বল্‌তে পারে?

(১০)

তন্ত্রশাস্ত্রে বলে,—"নাভিষেকাৎ বিনা কৌলঃ কেবলং মদ্য সেবনাৎ" এ কথা যে রাজতন্ত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সত্য, সে বিষয়ে অবশ্য কোনই সন্দেহ নেই। এতকাল আমরা বিলাতি পলিটিক্সের শুধু মদ্যপান করে এসেছি এইবার Reform-scheme-এর প্রসাদে সে পলিটিক্সে আমরা অভিষিক্ত হব। এ শুধু যথালাভ নয়—মহালাভ। এর কারণ, এ তন্ত্রে

অভিষেকের আমাদের পক্ষে প্রয়োজন আছে। পেট্রিয়টিজম ধর্ম্ম হতে পারে, কিন্তু পলিটিক্স হচ্ছে কর্ম্ম, এবং অপরাপর কর্ম্মের ন্যায় এ কর্ম্মেও কৃতীত্ব লাভ করবার জন্য কিঞ্চিৎ শিক্ষা দীক্ষার দরকার। তা ছাড়া ডিমোক্রাসি স্বদেশী মাল নয়—আহেল বিলাতি জিনিস, এবং এ বস্তুর এতদিন আমরা শুধু কাগজে কলমে চর্চ্চা করে এসেছি—এখন হাতে কলমে চর্চ্চা করবার দিন এসেছে।

(১১)

এই অভিষেক কথাটাই ত যত গোল বাধিয়েছে। বামাচারী ও দক্ষিণাচারীদের যত মারামারি সে সবই ত এ Scheme-য়ে ঐ বস্তুর অস্তি নাস্তি নিয়ে। কিন্তু এ নিয়ে অতি তুষ্ট কিম্বা অতি রুষ্ট হবার কোনও কারণ ত আমি দেখতে পাই নে। অতিতুষ্ট দলকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁরা কি মনে ভাবছেন যে, এই Scheme-এর প্রসাদে তাঁরা অর্দ্ধেক রাজ্য ও রাজকন্যা লাভ করেছেন? আর অতিরুষ্ট দলকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁরা কি মনে ভেবেছিলেন যে, ইংরাজ-রাজ, এই সুযোগে ভারতবাসীকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে, একছুটে "বাণপ্রস্থ" অবলম্বন করবেন?

(১২)

যারা রূপকথার রাজ্যে কিম্বা পৌরাণিক যুগে বাস করে নাঁ, তাদের বক্তব্য এই যে, Reform-scheme, আকাশের চাঁদও নয় দিল্লীর লাড্ডুও নয়, কিন্তু এমন জিনিষ—যার সাহায্যে আমরা আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবন গড়ে তোলবার সুযোগ পাব। ভুলে গেলে চল্‌বে না, যে স্বরাজ যখন আমরা উত্তরাধিকারীসূত্রে লাভ

করি নি, তখন তা আমাদের অর্জ্জন করতে হবে। এবং এ অর্জ্জন সাধনা অতএব সময়সাপেক্ষ।

(১৩)

সে যাই হোক্ এই Reform-Scheme-এর দৌলতে আর কিছু না হোক্ আমরা অন্তত একটা বিদ্যে শিখব। এই যুদ্ধের কৃপায় আমরা যেমন জিওগ্রাফি শিখেছি, এই Reform-এর কৃপায় আমরা তেমনি Constitutional Law শিখ্‌ব। তারপর যুদ্ধের ফলে আমাদের ঘরে ঘরে যেমন সব বড় বড় general তৈরি হয়ে উঠেছে, এই Reform-এর ফলে ঘরে ঘরে সব বড় বড় constitution builders তৈরি হয়ে উঠ্‌বে। ইতিমধ্যেই উকিলের আপিসে ও Bar Library-তে দু'চার জন "এত্তো বড়" constitution builder দেখা দিয়েছেন। জাতির পক্ষে এটা কি একটা কম লাভ! অতএব "এত্তো বড়" কথাটা কিছুতেই বলা যায় না যে Reform-scheme—"কিছু নয়"।

বীরবল।

ছোট কালীবাবু।

(তেপাটি) *

লোকে বলে আঁকা ছেলে ছোট কালীবাবু,
অপিচ বয়েস তার আড়াই বছর।
কোঁচা ধরে চলে যবে সেজে ফুলবাবু,
লোকে বলে বাঁকা ছেলে ছোট কালীবাবু।
ব্যামো হলে ব্রাণ্ডি খায়, খায় নাকো সাবু,
সুরে গায় তালে নাচে, হাসে চরাচর,
লোকে বলে পাকা ছেলে ছোট কালীবাবু,
যদিচ বয়েস তার আড়াই বছর।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

* ফরাসী কবিতা Triolet-এর ছাঁচে ঢালাই করে আমি এক সময়ে গুটি ছয়েক পদ্য রচনা করি এবং তার নাম দিই তেপাটি। সে সকল তেপাটিতে Triolet-এর ঠিক গড়নটি বজায় রাখতে পারি নি। হাত দুই জমির ভিতর কুঁচিমোড়া ভাঙ্গা যে কি কঠিন ব্যাপার, তা যিনি কখনো কসরৎ করেছেন তিনিই জানেন। তেপাটি লেখাও হচ্ছে লেখনীর একটা কসরৎ। Triolet অষ্টপদী কবিতা। এই আট পদের ভিতর, প্রথম পদটি ধুয়ো হিসেবে আর দু'বার, আর দ্বিতীয় পদটি আর একবার দেখা দেয়। তা ছাড়া এ পদ্যের ভিতর শুধু একজোড়া মিল আছে। প্রথম তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম আর সপ্তম পদ একসঙ্গে মেলে; বাকী তিন পদ একসঙ্গে মেলে। বলা বাহুল্য এ কবিতার ভাব ভাষা দুই নেহাৎ হাল্কা হওয়া চাই।